ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিজয় উল্লাস: ১৯৭১

১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং ২৬শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের জনগণ। পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার ২ লাখের অধিক মা-বোনের ত্যাগ এবং ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক এম. শহীদুল ইসলাম
অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম
ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু
ড. সুমেরা আহসান
মুহাম্মদ রকিবুল হাসান খান
রায়হান আরা জামান
জেরিন আক্তার
ড. মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন
সিদ্দিক বেলাল
উমা ভট্টাচার্য্য
মুহম্মদ নিজাম
সানজিদা আরা

সম্পাদনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ: , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

ইউসুফ আলী নোটন

প্রমথেশ দাস পুলক

বিভল সাহা

তামান্না তাসনিম সুপ্তি

প্রচ্ছদ

ইউসুফ আলী নোটন

গ্রাফিক্স

মো: রুহুল আমিন

মো: রাসেল হোসেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে । আশা করা যায় পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকটির মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

নতুন বছরে নতুন শ্রেণিতে তোমাদের অভিনন্দন, স্বাগতম।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া মানে শিক্ষায় প্রাথমিক পর্ব শেষ করে মাধ্যমিকে প্রবেশ। তোমাদের জন্যে পড়ালেখার নতুন এক পদ্ধতি নিয়ে আমরা অপেক্ষায় আছি। এ পদ্ধতিতে তোমাদের আর পরীক্ষা এবং ভালো নম্বরের পিছনে ছুটতে হবে না। কেবল পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্ন জানা আর সেসবের উত্তরের খোঁজে থাকতে হবে না। এখন থেকে উত্তর মুখস্থ করাও তোমাদের মূল কাজ নয়। বাবা-মায়েরও ভালো টিউটর, কোচিং সেন্টার, গাইড বই আর তোমাদের পরীক্ষা ও প্রশ্ন নিয়ে উদ্বেগে কাটাতে হবে না। অযথা অনেক টাকাও খরচ করতে হবে না।

আমরা জানি তোমাদের প্রত্যেকের রয়েছে এক একটা সতেজ মন আর একটা করে খুবই সক্রিয় মস্তিষ্ক। তোমাদের কল্পনা শক্তি যেমন আছে তেমনি আছে বুদ্ধি, তা খাটিয়ে পেয়ে যাও ভাবনার নানা পথ। মন আর মস্তিষ্কের মতো আরও কয়েকটা যোগ্যতা নিয়েই জন্মেছ সবাই। এগুলোর কথা বিশেষভাবে বলতে চাই। বলছি মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তির কথা। তোমরা আগেই জেনেছ আমাদের সবার আছে পাঁচটি করে বিশেষ প্রত্যঙ্গ– চোখ, কান, নাক, জিহ্বা আর ত্বক। এগুলো ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, এ হলো দৃষ্টিশক্তি, আর এটিকে বলি দর্শনেন্দ্রীয়। তেমনি কানে শুনি, এটি শ্রবণেন্দ্রীয়, নাক দিয়ে শুঁকি বা ঘ্রাণ নেই, এটি ঘ্রাণেন্দ্রীয়। জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি, এটি স্বাদেন্দ্রীয়; আর ত্বক দিয়ে স্পর্শ করি, এটি স্পর্শেন্দ্রীয়। কিছু চিনতে, বুঝতে, জানতে এগুলো আমাদের সহায়তা করে। তাই ইন্দ্রিয়গুলো এতো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ।

এতসব সম্পদ মিলিয়ে তোমাদের প্রত্যেকের আছে–

অফুরন্ত প্রাণশক্তি
সীমাহীন কৌতূহল
আনন্দ পাওয়ার অসীম ক্ষমতা এবং
বিস্মিত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা।

আধুনিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পরীক্ষা আর উত্তর মুখস্থ করার যে চাপ তাতে তোমাদের এসব স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ব্যাহত হয়। শিক্ষায় বরং শিক্ষার্থীদের এই ক্ষমতাগুলোকেই কাজে লাগানো দরকার, তাতেই ভালো ফল মিলবে।

এ থেকে তোমাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে একটু ধারণা নিশ্চয় পেয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ, এই ব্যবস্থায় তোমরা বেশ স্বাধীনতা পাচ্ছ। তবে ভুল না, স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে দায়িত্বও নিতে হয়। আচ্ছা, পড়ালেখাটা তো তোমার নিজেরই কাজ, নিজের জন্যেই। তো নিজের কাজ নিজে করবে, এতো খুব ভালো কথা।

তবে আসল কথা হলো, কোনো কাজে যখন নিজেই সফল হবে তাতে আনন্দ যে কত বেশি তা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পার। তাই নতুন পথে শিক্ষা হবে আনন্দময় যাত্রা, পথচলা। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে– যাত্রাপথের আনন্দগান। শিক্ষা হলো আনন্দগান সেই অভিযাত্রা– যেন গান করতে করতে পথ চলেছ।

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে মাত্রই উঠেছ। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ। নতুন শ্রেণির পাঠের অনেক কিছুই হবে নতুন, অনেকটা বা অজানা। তবে অজানা আর নতুন বলেই তো এ পথচলাটা হবে অভিযানের মতো। পথে যে চ্যালেঞ্জ থাকবে সেগুলো পেরুনোর অভিজ্ঞতা থেকে যেমন অনেক কিছু জানবে, শিখবে, করবে তেমনি পাবে অফুরন্ত আনন্দ।

অথচ এর জন্যে বাড়তি কোনো খরচ লাগবে না। কারণ চ্যালেঞ্জ মোকবিলার জন্যে তোমাদের ভাঁড়ারে আছে নিজস্ব শক্তিশালী হাতিয়ার– কৌতূহল, বিস্ময়বোধ, প্রাণশক্তি এবং আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়গুলো এতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। আর মজা হলো এগুলো টাকা-পয়সার মতো নয়, ব্যবহারে খরচ না হয়ে বরং বাড়ে। কারণ এসবই তোমার মনের সম্পদ, তুমি যত চর্চা করবে ততই এগুলো ঝকঝকে থাকবে, কাজে হবে দক্ষ। বরং এদের প্রেরণায় তোমাদের নতুন নতুন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে। প্রথম ডাক পড়বে বুদ্ধির। নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে হবে, ভাবতে হবে, আবার ভাবতে গেলে যুক্তির প্রয়োজন। এ হলো চর্চার বিষয়– বুদ্ধি খাটালে তা আরও বাড়বে, দেখবে কোনো কোনো গাছের ডালপাতা ছেঁটে দিলে গাছটি বাড়ে ভালো, ফলও দেয় বেশি। তোমাদের চাই বুদ্ধিকে খাটানো, যুক্তিতে শান দেওয়া। আর ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রাখতে হবে, তাতে এদের দক্ষতাও বাড়তে পারবে।

এভাবে অজানাকে জয় করবে, অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে চলতে চলতে বিস্ময়ে-আনন্দে মজে কখন যে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তবে শুরু হোক এই জয়যাত্রা!

সূচিপত্র

নানা পরিচয়ে আমি	১-২৫
সক্রিয় নাগরিক ক্লাব	২৬-৩১
ইতিহাস জানার উপায়	৩২-৩৫
বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি	৩৬-৪৯
বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব	৫০-৬২
দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব	৬৩-৭৩
প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম	৭৪-৮১
আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ	৮২-১০৪
হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয়	১০৫-১১৩
বই পড়া কর্মসূচি	১১৪-১১৬
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো	১১৭-১৩৩
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক	১৩৪-১৫৪
সমাজ ও সম্পদের কথা	১৫৫-১৬৫
পরিশিষ্ট	১৬৬-১৭৫

নানা পরিচয়ে আমি

নতুন বছরের প্রথম ক্লাস: বন্ধুদের সাথে পরিচয়ের খেলা

ষষ্ঠ শ্রেণিতে অনেক নতুন মুখের আনাগোনা। অনেকে সবাইকে আগে থেকে চেনে না। নতুন শ্রেণিতে সবার মনে রোমাঞ্চ আর উৎকণ্ঠা। অনেকেই সহপাঠীদের চেহারা, পোশাক আর বাচনভঙ্গি দেখে অনুমান করার চেষ্টা করছে কাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে। আয়েশা সামনের দিকের একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসেছিল। এমন সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আমার নাম খুরশিদা হক, সবাই ডাকে খুশি আপা। আমি তোমাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক। ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাসে তোমাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

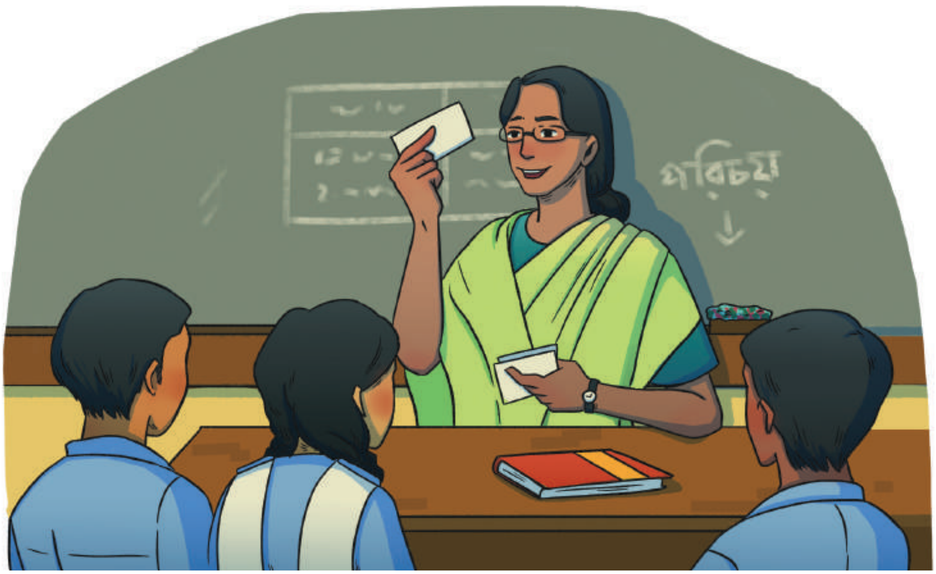

তিনি বললেন, আমার পরিচয় তো এক রকমভাবে পেলে। এখন তোমাদের সাথে পরিচিত হওয়ার পালা। আমি ভাবছি, তোমাদের সাথে একটা নতুন উপায়ে পরিচিত হবো। চলো আমরা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে বসে কিছু কাজ করি–

- প্রথমে প্রত্যেকে একটা করে কাগজ নিই।
- এবার এসো এই কাগজে আমরা নিজের পরিচয় তুলে ধরার জন্য নিজের সম্পর্কে কিছু তথ্য লিখি। মনে রেখো কাগজে আমরা কেউ নিজেদের নাম লিখব না। সবার লেখা শেষ হয়ে গেলে খুশি আপা কাগজগুলো এক জায়গায় জড়ো করলেন এবং সেখান থেকে একটি কাগজ তুলে নিয়ে সবাইকে তাতে লেখা পরিচয়ের বর্ণনা পড়ে শোনালেন এবং ওদের কাছে জানতে চাইলেন বর্ণনার সাথে মিল আছে এমন শিক্ষার্থী কে হতে পারে?

আত্মপরিচয়ের বর্ণনা

আমি বই পড়তে ভালোবাসি। নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে আমি খুব পছন্দ করি। চারপাশের মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমার অনেক কৌতূহল। আমি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছি। সাঁতার কাটতে আমার খুব ভালো লাগে। বড়ো হয়ে আমি একজন বিজ্ঞানী হতে চাই।

কাগজে লেখা পরিচয়ের বর্ণনা শুনে সবাই আশেপাশের বন্ধুদের দিকে তাকাতে শুরু করল। নানা গুণ ও বৈশিষ্ট্য বোঝার চেষ্টা শুরু করল। এবার এর ভিত্তিতে তারা নাসির, আয়েশা, জয় আর মিলিকে কাগজে বর্ণিত শিক্ষার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিল। খুশি আপা অবাক হয়ে বললেন, বাহ্! আত্মপরিচয়ের কাগজ একটা, কিন্তু তোমরা খুঁজে পেয়েছ চার জনকে। ফলে খুশি আপাই জানতে চাইলেন, কাগজটা কার ছিল? মিলি জানাল যে, কাগজটা তার। কিন্তু বাকি তিনজনও এটা জেনে খুশি হলো যে, তাদের অনেকের মধ্যেই মিল রয়েছে। এতে খুব দ্রুতই তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেল। এরপর খুশি আপা আরও কিছু আত্মপরিচয়ের কাগজ তুলে পড়ে শোনালেন।

আত্মপরিচয়ের বর্ণনা

আমি ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করি। সমুদ্র আমার খুব প্রিয়। আমার প্রিয় রং নীল। ক্রিকেট খেলতে আমার খুব ভালো লাগে। বড়ো হয়ে আমি ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে চাই।

আমাদের মিল-অমিল

আত্মপরিচয়ের কাগজ থেকে প্রতিবারই দেখা গেল একসাথে অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যাদের একই রকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তখন খুশি আপা সবার কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। কেন বার বার আত্মপরিচয়ের একটা কাগজে বন্ধুদের কয়েকজনকে একই রকম বৈশিষ্ট্যের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে? সবাই বলে উঠল, কারণ আমাদের এক জনের সাথে অন্য জনের অনেক মিল রয়েছে। খুশি আপা বললেন, আচ্ছা এবার বলো তো এভাবে পরিচিত হয়ে তোমাদের কেমন লাগল? নাসির বলল, খুব ভালো লেগেছে। কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বাইরে যত অমিলই দেখাক না কেন, আমাদের মধ্যে আসলে অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে। তাছাড়া এ কাজটা করে সবার সম্পর্কে এক সাথে এমন অনেক কথা জানতে পারলাম যা জানতে হয়ত আমাদের অনেক দিন লেগে যেতো। এরপর খুশি আপা বললেন, তাহলে প্রতিদিন ক্লাসের শুরুতে অবশিষ্ট কাগজগুলো থেকে কিছু কিছু কাগজ নিয়ে পড়ে দেখব।

আমি কে?

এ পর্যায়ে খুশি আপা সবার উদ্দেশ্যে বললেন যে, এতক্ষণ আমরা যা করলাম তার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পরিচয় তুলে ধরা। তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ আমরা প্রত্যেকে অন্যের সামনে নিজেদের যে বিশেষ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তাতে একটিমাত্র পরিচয় ছিল না। আসলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একজন

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মানুষের বিভিন্ন পরিচয় গড়ে ওঠে। তারপরেও এসবই আমাদের আত্মপরিচয়ের অংশমাত্র। এরকম আরও অনেক বিষয় মিলে একটা সমাজের, জাতির, মানুষের আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে।

তোমরা কি জানতে চাও আমাদের আত্মপরিচয় কীভাবে গড়ে উঠেছে? আজ আমরা যে কার্যক্রম শুরু করলাম এর ধারাবাহিকতায় সারা বছর ধরে আমরা আরও অনেক মজার মজার কাজ করব। এটা একটা অভিযাত্রার মত। এই অভিযাত্রায় আমরা যেমন দেখব সুদূর প্রাচীনকালে মানুষ কীভাবে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে জীবন যাপন করেছে, সময়ের সাথে সভ্যতার বিকাশে ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি জানব কীভাবে গড়ে তুলেছে পরিবার, সমাজ, আইন-কানুন, রাষ্ট্র প্রভৃতি। আর এসবের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পেয়েছে এই ভূখণ্ডের মানুষের আত্মপরিচয়। খুশি আপা আনন্দের সাথে বললেন, আত্মপরিচয়ের ধারণাটিকে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য এখন থেকে আমরা ধাপে ধাপে অনেক মজার মজার কাজ করব এবং শিখবো। চলো এবার শুরু করা যাক আমাদের আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের অভিযাত্রা।

এরপর খুশি আপা, বোর্ডে আত্মপরিচয় শব্দটি লিখলেন এবং সবাইকে বললেন, এই শব্দটি দিয়ে কে কী বুঝেছ তা বলো। শুভ বলল, আত্মপরিচয় হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে "আমি কে?" এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। আর মিলি বলল, আমরা এতক্ষণ কার্ডে নিজেদের সম্পর্কে যা লিখেছি তা এই আত্মপরিচয়েরই অংশ মাত্র।

খুশি আপার মতো করে আত্মপরিচয়ের বর্ণনার খেলাটি চলো আমরা আমাদের এলাকার বন্ধুদের সাথেও খেলি।

আমার আত্মপরিচয়

পরের দিন খুশি আপা বললেন, আমরা কি আর কারো আত্মপরিচয় সম্পর্কে জানতে চাই? মিলি বলল, আমরা কয়েকজন বরেণ্য মানুষ, যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম রোকেয়ার পরিচিতিপত্রও তৈরি করতে চাই।

বিখ্যাত মনীষীদের পরিচয়ের ছক তৈরি করি

এবার বিখ্যাত মনীষীদের পরিচয়ের ডালা খোলার পালা। চলো প্রথমে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলেবেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পড়ে সেখান থেকে তাঁর পরিচয়ের ছক তৈরি করে একটু অনুশীলন করে নেই। নিচে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর জীবনীটা দলে ভাগ হয়ে দ্রুত পড়ে নিই আর পরিচিতিসূচক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিয়ে রাখি। সেগুলো তাঁর পরিচয়ের ছক তৈরিতে সাহায্য করবে। ছক তৈরি হয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সেগুলো উপস্থাপন করল এবং দৃশ্যমান জায়গায় টানিয়ে দিল। সবশেষে মনীষীদের পরিচয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করল:

ছেলেবেলার মুজিব

১.

শেখ মুজিবুর রহমান– এই নামটি তুমি জানো। অনেকবার শুনেছ। তাঁর অনেক ছবিও নিশ্চয় দেখেছ। তাঁর একটি ছবি বেছে নিয়ে বড়োদের সাহায্যে বাঁধিয়ে নিতে পার।

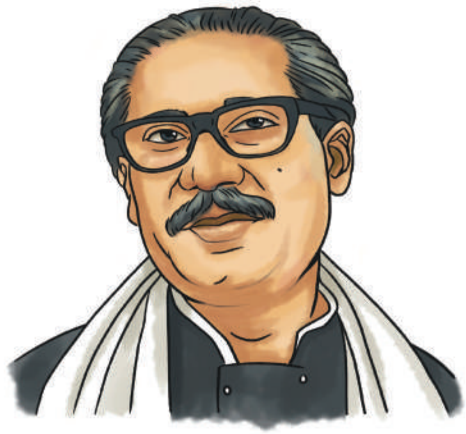

সেটা তোমার পড়ার টেবিলে রাখতে পার। সামনের দেওয়ালেও টাঙাতে পার। অথবা বাসার কোনো সুন্দর জায়গায় ঝুলিয়ে দিতে পার।

মানুষ ভালোবেসে তাঁকে ডাকে বঙ্গবন্ধু। তাই আমরা বলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তুমি বঙ্গবন্ধুর যে ছবিটা বাছাই করেছ তার নিচে ঠিকভাবে তাঁর নাম এবং দুটি তারিখ লিখবে– ১৭ই মার্চ ১৯২০– ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫।

এ দুটি তারিখ কেন বলো তো? হয়ত অনেকেই আন্দাজ করতে পারছ, প্রথমটি জন্ম তারিখ ও সাল আর দ্বিতীয়টি মৃত্যু তারিখ ও সাল।

তিনি আমাদের জাতির পিতা। আমরা তাঁকে কেন জাতির পিতা বলে জানি?

তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, কখনো ভয় পেয়ে পিছু হটেন নি, ওদের সাথে মন্ত্রিত্ব বা কোনো কিছুর বিনিময়ে আপোস করেন নি। তিনি নিজের জন্যে কখনো কিছু চান নি, এমনকি নিজের জীবনের পরোয়া করেন নি। ওদের ষড়যন্ত্র, নির্যাতন, মামলা কিছুতেই তিনি টলেন নি। এমন নেতা এদেশের মানুষ আগে কখনো দেখে নি। তাই সবাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। জানো তো বাঙালি বরাবরের এক সংগ্রামী জাতি, তবে বড়ো কোনো যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাদের তেমন ছিল না। তিনিই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করলেন আর সাহসী, নির্ভীক, দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে বীরের জাতিতে পরিণত করলেন। বঙ্গবন্ধু না হলে এমনটা হতো না। তাই তিনিই আমাদের জাতির পিতা।

চলো আজকে আমরা সে মানুষটা ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন সেই গল্পটা শুনি।

২.

টুঙ্গিপাড়া– বাংলাদেশের একটা গ্রাম। সে গ্রামে একটি নদী আছে – মধুমতি। ধানক্ষেত, পুকুর, দিঘি, বিল আর ঝোপঝাড় বনবাদাড় নিয়ে সে নিভৃত বাংলার শান্ত এক গ্রাম। আর দশটা গাঁয়ের মতো সেখানেও মাছ পাওয়া যেত প্রচুর, পাখির কলকাকলিতে থাকত মুখর। গরু-বাছুর চড়ত মাঠে। পাড়ায় কিছু দালান, মাটির দাওয়া, টিনের ছাউনি ঘর, বাঁশ-বেড়ার ঘর, ভ্যান্না পাতার ছাউনি কুঁড়েঘরও ছিল। ছিল না পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ, গাড়ি। লোকে চলাচল করত পায়ে হেঁটে। আর ছিল নৌকা– নানা রকম।

এই গাঁয়ে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। পরিবারে আনন্দের ঢেউ। নাম রাখা হয় মুজিবুর রহমান, বংশের উপাধি শেখ থাকবে নামের আগে। বাবা-মায়ের মুখে মুখে ডাকনাম হয়ে গেল খোকা। ছোটো খোকা বড়ো হচ্ছে মায়ের সাথে গ্রামে, টুঙ্গিপাড়ায়। ছোটোবেলা থেকেই খেলাধুলায় ঝোঁক ছেলেটির। তার ছিল ছোটোদের দল। খোকাই তাদের নেতা। গাছের আম পেড়ে খায়, গাছের

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ফুল তুলে নেয়, আর থেকে থেকে তারা দল বেঁধে খেলায় মেতে ওঠে। একসময় ফুটবল খেলতে শুরু করে। খোকা বেশ ভালোই খেলে।

গ্রামের স্কুলেই ভর্তি করে দেওয়া হয় শিশু মুজিবকে। এখানে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ শেষ করার পরে বাবা তাকে নিয়ে আসেন গোপালগঞ্জ শহরে, নিজের কাছে রেখে পড়াবেন। বলা হয় নি বুঝি, বাবা শেখ লুৎফর রহমান এখানে সরকারি অফিসে দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

এবার মুজিব চলল গোপালগঞ্জ শহরে, হাইস্কুলে পড়বে। সারাক্ষণের বন্ধুদল আর অতিচেনা গাছপালায় ছাওয়া পুকুর-বিল ঘেরা মায়ের গন্ধমাখা টুঙ্গিপাড়ার মায়াভরা দিন পিছনে ফেলে মুজিব এলো গোপালগঞ্জ শহরে। ভর্তি হলো গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলের ক্লাস ফোরে। থাকে বাবার সাথে।

বাবার হাত ধরেই সপ্তাহের ছুটিতে আর স্কুলের লম্বা বন্ধের সময় ফেরে গাঁয়ে মায়ের কোলে। মাকে ছেড়ে চেনা পরিবেশ ছেড়ে থাকতে কষ্ট হলেও একসময় সয়েও গেছে। নতুন জায়গায় নতুন নতুন বন্ধুও হয়েছে।

শিশু মুজিব কিন্তু মোটেও কেবল পড়া আর পরীক্ষা নিয়ে সময় কাটিয়ে দেয় নি। নানা দিকে তার উৎসাহ – খেলাধুলায় সবচেয়ে বেশি। তার মধ্যে ফুটবল সবার উপরে। বড়ো হয়ে ঐ সময়ের কথা তিনি নিজেই লিখেছেন –ছোটো সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভালো ব্রতচারী করতে পারতাম।

ভাবো তো, আমাদের বঙ্গবন্ধু গানও গাইতে পারতেন। তিনি যে বরাবর গান পছন্দ করতেন সে পরিচয় আমরা পরেও পেয়েছি। তোমরা তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পড়লে তাঁর জীবনের আরও অনেক কথা জানতে পারবে। বড়ো হয়ে অবশ্যই পড়বে।

৩.

কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন। প্রাণবন্ত শিশুটা হঠাৎ করেই এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো – বেরিবেরি। রোগের নামটা মজার, কিন্তু স্বভাবটা খারাপ। সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল, এ সময় লেখাপড়া বন্ধ করে দু'বছর তাঁর চিকিৎসা চলে। ডাক্তার দেখাতে কলকাতা যেতেন আর বাকি সময় গাঁয়ে মা আর ফুফুদের সেবায় সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন। দুই বছরের চিকিৎসায় বেরিবেরি থেকে ভালো হলেও এবার দেখা দিলো গ্লুকোমা, চোখের অসুখ। আগের রোগে হার্ট দুর্বল হয়েছে, এবারে চোখের দৃষ্টি কমে গেল। চিকিৎসা চলল আবারও কলকাতায়। এই মহানগরী কলকাতা তখন অবিভক্ত বাংলার রাজধানী। ভালো ডাক্তার, হাসপাতাল, বাজার-সওদা, স্কুল-কলেজ সব কিছুর কেন্দ্র তখন কলকাতা।

অসুখের কারণে লেখাপড়ায় বেশ পিছিয়ে পড়তে হলো। ১৯৩৬ সালে আবার স্কুলে ফেরা। এবারে মাদারীপুর হাইস্কুলে, কারণ ততদিনে বাবা শেখ লুৎফর রহমান বদলি হয়ে গেছেন মাদারীপুরে। এখানেও তিনি সরকারি অফিসে দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু এসময় মুজিবের চোখের অসুখ আবার বেড়ে গেল। কলকাতার ডাক্তার অপারেশন করতে বললেন। বলেছেন তাড়াতাড়ি না করলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই দ্রুতই দুই চোখের অপারেশন করতে হলো। ভালো হয়ে চশমা নিতে হলো এবং সেই ১৫/১৬ বছর বয়স থেকে তাঁকে সবসময় চশমা পরতে হয়েছে।

এভাবে লেখাপড়া আবার ঠিকভাবে শুরু করতে করতে ১৯৩৭ সাল এসে গেল। বালক মুজিব পুরানো স্কুলে আর যেতে চাইল না। বন্ধুরা যে তাকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেছে। এই সময় কিছুদিন তার বাসায় পড়ার ব্যবস্থা হলো। কাজী আবদুল হামিদ নামে এমএসসি পাশ একজন শিক্ষক বাড়িতেই তার পড়ালেখার সহায়তা করতেন। হামিদ সাহেব পড়ানোর পাশাপাশি গরিব ছাত্রদের সহায়তা দেওয়ার জন্যে একটি মুসলিম সেবা সমিতি গড়ে তুললেন।

বালক মুজিব এবং আরও ছেলেরা মিলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল সংগ্রহ করত। সেই চাল বিক্রি করে গরিব ছাত্রদের বই-খাতা দেওয়া হতো, পরীক্ষা ও অন্যান্য খরচ দিয়েও সাহায্য করা হতো। হায়, কী দুর্ভাগ্য হঠাৎ করেই অসুখে ভুগে শিক্ষক হামিদ সাহেব মারা যান। কিন্তু তাঁর যোগ্য শিষ্য মুজিব আছে না! ততদিনে বালক মুজিব মানুষের জন্য কাজ করার উৎসাহ পেয়ে গেছে।

খেয়াল করেছ বালকের কয়েকটি বিশেষ গুণ – তাঁর সাহস ছিল, গরিবের প্রতি ছিল দরদ, নেতা হওয়ার গুণ ছিল এবং দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ছিল প্রবল।

৪.

১৯৩৮ সালের ঘটনাটা না বললেই নয়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সর্বপ্রথম জনগণের মন জয় করতে পেরেছিলেন বরিশালের এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)। তাঁকে মানুষ সম্মান করে ডাকত শের-এ-বাংলা অর্থাৎ বাংলার বাঘ। লম্বা চওড়া মানুষ। তিনি তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। আর শহিদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)– আরেকজন বড়ো মাপের নেতা, তখন শ্রমমন্ত্রী। ঠিক হলো নেতাদের নিয়ে বড়ো করে সভার আয়োজন হবে। সঙ্গে থাকবে একটা প্রদর্শনী, এতে দোকানপাটের সঙ্গে জেলার কৃষি আর কুটির শিল্পের নমুনাও থাকবে। যারা এসব আয়োজন করবে, দেখাশুনা করবে সেই স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা হলেন শেখ মুজিব।

সব ভালোভাবে হয়ে গেল। সভা শেষে নেতাদের বিদায় দেওয়ার সময় মুজিব সামনে এগিয়ে এসে দুই নেতাকে স্কুলের ছাত্রাবাসের ছাদ মেরামত করে দেওয়ার দাবি জানাল। কারণ বর্ষায় ছাদের ফুটো দিয়ে পানি পড়ে, ছাত্রদের খুব অসুবিধা হয়। তাঁর শিক্ষকরা তো ছাত্রের সাহস দেখে তাজ্জব, ভয়ও পেয়েছিলেন, নেতারা কিছু মনে করেন কিনা এই ভেবে। কিন্তু প্রকৃত নেতা হয়ত এই তরুণের মধ্যে ভবিষ্যতের নেতার গুণই দেখতে পেয়েছিলেন।

খেলাধুলা আর কাজকর্মে ডুবে থাকতে থাকতেই চলে এলো স্কুলপর্ব শেষে আজকের এসএসসির মতো সেকালের প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়। ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করলেন মুজিব। তারপরে কলেজের পড়া। পাড়ি দিলেন কলকাতায়। কলকাতায় পড়াশুনার পাশাপাশি তাঁর কাজের পরিসর অনেক ব্যাপক হয়েছে। তাঁর জীবনের সেইসব কথা তোমরা 'আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ' অধ্যায়ে এবং পরবর্তী শ্রেণিতেও জানবে।

বঙ্গবন্ধুর আত্মপরিচয়ের ছক তৈরি করি

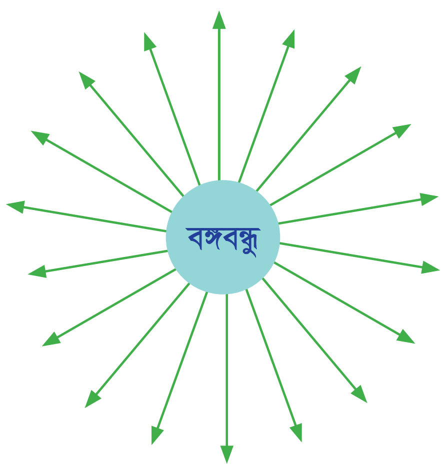

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: নারী জাগরণের দিশারী

মেয়েরা ঘরের ভেতর বন্দি হয়ে আছে, তাদের লেখাপড়া করার সুযোগ নেই, বাইরের পৃথিবীর সাথে নেই কোনো রকম যোগাযোগ, ছোট্ট ঘরটাই তাদের কাছে পৃথিবী– এমনটি কি এখন ভাবা যায়? অথচ এক সময় এটাই ছিল স্বাভাবিক। মেয়েদের জীবন ছিল নিষেধের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এমনই এক সামাজিক পরিবেশে জন্ম বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের, ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বরে।

রোকেয়া জন্মেছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারে। রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ছিল তাঁদের বিশাল জমিদার বাড়ি। প্রাচীরঘেরা এই বাড়িটি ছিল প্রায় সাড়ে তিনশ বিঘা এলাকা জুড়ে। রোকেয়ার বাবা জহিরুদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ছিলেন এই বংশের শেষ জমিদার। রোকেয়ার মায়ের নাম ছিল রাহাতুন্নেসা চৌধুরী। তাঁদের পাঁচ সন্তানের মধ্যে বেগম রোকেয়া ছিলেন চতুর্থ। বাড়িতে সবাই তাঁকে রুকু বলে ডাকত।

জমিদার পরিবারে প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যে বড়ো হচ্ছিলেন রোকেয়া। তাঁদের পরিচর্যার জন্য ছিল পরিচারিকার দল। তবুও তাঁর ছেলেবেলাটা মোটেই আনন্দের ছিল না। এমন খাঁচায় বন্দি পাখির জীবন কারই বা ভালো লাগে? শুধু যে ছেলেদের সামনে বের হওয়া বারণ তা নয়, পরিবারের বাইরে অন্য কোনো মহিলা বেড়াতে এলেও বড়োরা চোখের ইশারায় সরে যেতে বলতেন।

বড়ো ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম আবুল আসাদ সাবের কবিতা আবৃত্তি করতেন চমৎকার। রোকেয়ার বড়ো বোন করিমুন্নেসার লেখাপড়ায় ছিল দারুণ উৎসাহ। ইব্রাহিম লুকিয়ে তাঁকে পড়াতেনও। এক সময় একথা জেনে গেলেন তাঁদের বাবা এবং বাইরের লোকজন। বাবা বাধ না সাধলেও ক্ষেপে গেল সমাজ। করিমুন্নেসার বিয়ে দেওয়াই মুশকিল হয়ে গেল। ব্যস, বন্ধ হয়ে গেল করিমুন্নেসার লেখাপড়া।

তারপরও রোকেয়াকে বাংলা বর্ণের সাথে পরিচয় করালেন করিমুন্নেসা। আর পরিবারের নিষেধ অমান্য করে রোকেয়াকে ইংরেজি শেখালেন বড়ো ভাই ইব্রাহিম। অনেক রাতে পুরো বাড়িটা যখন ঘুমিয়ে, তখন মোম জ্বালিয়ে ইব্রাহিম আর রুকু লেখাপড়া করতেন। এভাবেই বেগম রোকেয়া আরবি, ফারসি, উর্দুর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন। সকল বাধাবিপত্তি দূরে ঠেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এই ছিল শুরু।

রোকেয়ার বয়স যখন আঠারো তখন তাঁর বিয়ে হলো খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াতের বয়স ছিল তখন চল্লিশ। বিহারের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হলেও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি দারিদ্র্যকে জয় করেছিলেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তিনি ছিলেন অবাঙালি, তবে হুগলি কলেজে বাঙালি সহপাঠীদের কাছে বাংলা শিখেছেন। আদর্শ চরিত্রের সাখাওয়াতকেই রোকেয়ার স্বামী হিসেবে সকলের পছন্দ হলো।

বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে তিনি চলে এলেন ভাগলপুরে। এখানেও মেয়েদের দুরবস্থা রোকেয়াকে ভীষণ কষ্ট দিলো। তিনি অনুভব করলেন, মেয়েরা যদি শিক্ষার আলো না পায় তাহলে কখনো তারা এই শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এ ব্যাপারে তিনি স্বামীর সাথে প্রায়ই আলাপ করতেন।

স্বামীর সহযোগিতা পেয়ে রোকেয়ার ইংরেজি ভাষা চর্চায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ইংরেজিতে অনেক মূল্যবান বই ও সাময়িকপত্র তিনি রোকেয়াকে পড়তে দিতেন। ফলে স্বামীর সরকারি কাজেও রোকেয়া সাহায্য করতে পারতেন। বিয়ের পর দুই কন্যা সন্তানের মা হয়েছিলেন রোকেয়া। কিন্তু অল্প বয়সে মারা যায় সন্তান দুটি। সাংসারিক কাজের ফাঁকে লিখলেন ইংরেজিতে 'Sultana's Dream' নামে একটি কাহিনি। সাখাওয়াত হোসেন সেই লেখা পাঠিয়ে দিলেন একটি সাময়িকপত্রে এবং কোনো ধরনের পরিমার্জনা ছাড়াই তা ছাপা হলো।

এ সময় সাখাওয়াত হোসেনের শরীর খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। তাঁর মন বলল, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে রোকেয়া খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন। এ থেকেই সাখাওয়াত একটি মেয়েদের-স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন এবং তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকে দশ হাজার টাকা আলাদা করে রাখলেন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য। এর কিছুদিন পর ১৯০৯ সালের ৩রা মে তিনি মারা যান।

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ভাগলপুরেই বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল'। শুরুতে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল পাঁচ। তবে পারিবারিক কিছু জটিলতার কারণে তাঁকে ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হলো। এখানেই ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ থেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা পেল 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। ৮ জন ছাত্রী নিয়ে শুরু করলেও ক্রমে ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে লাগল।

রোকেয়ার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল না। তারপরও তিনি স্কুলের কাজে কোনো ত্রুটি হতে দেন নি। তিনি বলেছেন, 'শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বালিকাদিগকে নানাভাবে দেশ ও জাতির সেবায় এবং পরোপকারব্রতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাও আমাদের প্রধান একটি উদ্দেশ্য।'

স্কুল চালানোর পাশাপাশি অব্যাহত ছিল রোকেয়ার সাহিত্য চর্চা। তিনি একাধারে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেছেন। সবখানেই সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধ লিখে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও কড়া ভাষায় নারী সমাজের ওপর যে অন্যায় জুলুম করা হয় তার সমালোচনা করেছেন।

১৯১৬ সালে তিনি আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রে মেয়েদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা।

নারী শিক্ষাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া। তাঁর রচিত সাহিত্যেও তিনি এই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি বারবার বলতে চেয়েছেন, নারী সমাজকে জাগতে হবে, নইলে মুক্তি নেই। তাঁর আরেকটি আদর্শ ছিল সত্যনিষ্ঠা। তিনি বলেছেন, 'সত্য প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক, সত্যকে বুঝব, খুঁজব এবং গ্রহণ করব।'

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর। সেদিন ছিল রোকেয়ার ৫২তম জন্মবার্ষিকী। খুব সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে ওযু করলেন। হঠাৎ বুকে ব্যথা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নিল প্রচণ্ড রূপ। এক সময় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

রোকেয়া চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর আদর্শ। সে আদর্শ নারী সমাজের উন্নতির আদর্শ। নারী সমাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজন আত্মমর্যাদাবোধ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, জ্ঞান আর সাধনা। একমাত্র শিক্ষাই নারীকে এনে দিতে পারে এই অর্জন।

চলো আমরাও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বেগম রোকেয়ার জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক জেনে তাঁদের পরিচয়ের ছক তৈরি করি। বাসায় ভাইবোন বা এলাকায় বন্ধুদের সাথে এরকম আরও মনীষীর পরিচয়ের ছক তৈরি করব, তাঁদের জীবন কথা লিখব, এ নিয়ে আলোচনা করব।

ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছক

এবারে খুশি আপা ক্লাসে এক মজার ছবি দেখালেন। গোল চাকতির মত একটি ছক। ছকে আত্মপরিচয় তুলে ধরতে আমাদের নিজেদের বিষয়ে অনেক কিছু লেখার জায়গা রয়েছে। ক্লাসের প্রত্যেকে নিজের বিষয়ে সেখানে লিখল। হয়ে গেল সবার ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছক।

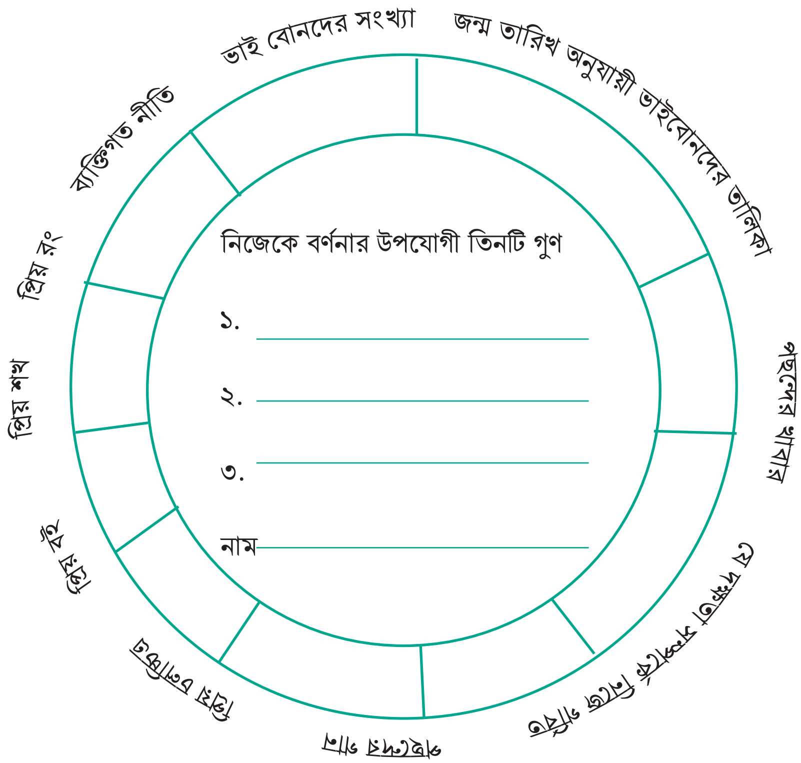

এ পর্যায়ে খুশি আপা ছক ও প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে সকলের অংশগ্রহণে একটি সাধারণ আলোচনার আয়োজন করে বললেন, দেখলে তো ব্যক্তিগত পরিচয় মানুষের শুধু দুই/একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হয় না, তা আসলে বহুমাত্রিক। অর্থাৎ এক একজন মানুষের আত্মপরিচয়ের ছক এক এক রকমের হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের

কাছের বন্ধুটির সাথে আমাদের যেমন মিল রয়েছে, তেমনি রয়েছে অমিল। অর্থাৎ আত্মপরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষ অনেক ভালো বন্ধু হতে পারে।

আমরাও চলো আত্মপরিচয়ের ছকটি পূরণ করি, প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি এবং বন্ধুদের সামনে তুলে ধরি

সামাজিক পরিচয়

ইতোমধ্যে আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এখন আমরা জানব আমাদের সামাজিক পরিচয় সম্পর্কে।

মেয়েদের ফুটবল

পরদিন ক্লাসে এসে খুশি আপা জানতে চাইলেন, তোমরা কি ফুটবল খেলা পছন্দ করো?

ফাতেমা, দীপা, নাসির, হারুন, বুশরা সবাই সমস্বরে বলে উঠল, হ্যাঁ, ফুটবল আমাদের খুব ভালো লাগে।

খুশি আপা বললেন, আজ আমরা সবাই ক্লাসে ফুটবল খেলা নিয়ে কথা বলব। সবাই খুশিতে হাততালি দিলো।

খুশি আপা সবাইকে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল দলের চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনাল খেলার একটি রিপোর্ট পড়তে দিলেন। ক্লাসের সবাই ৫/৬ জনের দলে বসে রিপোর্টটি পড়তে লাগল এবং বাংলাদেশের মেয়েরা লড়াই করে কীভাবে জিতেছে তা জেনে উল্লসিত হলো।

সাফ অনুর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা

বুধবার (২২ ডিসেম্বর): কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখল বাংলাদেশ। খেলার শুরু থেকেই আক্রমণ করে আসছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পুরো ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে। তবে বাংলাদেশ ম্যাচের ১৬ মিনিটেই লিড পেতে পারত। ভারতের গোলরক্ষক ভুল করে বল গ্রিপে নিতে পারেননি। তহুরার নেওয়া শট ভারতের গোলরক্ষক গোল লাইনে সেভ করে। বাংলাদেশের ফুটবলারদের দাবি ছিল বল লাইন ক্রস করেছে। রেফারি অবশ্য তার অবস্থানে অনড় থাকেন। রিপ্লেতে অবশ্য দেখা গেছে বল লাইনের ওপর ছিল। তবে ৭৬ মিনিটে বল গোললাইন ক্রস করে জালেও গিয়েছিল কিন্তু সহকারী রেফারি অফসাইডের পতাকা তুললে সেই গোলটিও বাতিল হয়ে যায়।ফাইনালে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল ক্রসবারও। ২৫ মিনিটে বাংলাদেশের থ্রো ইন থেকে করা আক্রমণ সাইডপোস্টে লেগে ফেরত আসে।

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মিনিটে শামসুন্নাহার জুনিয়রের শটও পোস্টে লাগে।

তবে প্রথমবারের মতো দেশে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে বাংলাদেশকে খালি হাতে ফিরতে হয়নি।

ভারতীয় মেয়েদের কাছ থেকে বারবার বল কেড়ে নিলেও শেষ পর্যন্ত গোলের দেখা মিলছিল না বাংলাদেশের। শেষ পর্যন্ত ৭৯ মিনিটে আনাই মগিনি এগিয়ে দেন বাংলাদেশকে। রিপা ব্যাকহিল পাস করেন। আনাই মগিনি বক্সের বাইরে থেকে শট নেন। ভারতের গোলরক্ষক বলের ফ্লাইট বুঝতে পারেননি। তিনি বলে হাত লাগালেও গোল লাইন অতিক্রম করা থেকে বিরত রাখতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গেই উল্লাসে মেতে ওঠে পুরো কমলাপুর স্টেডিয়াম। শেষ পর্যন্ত এই এক গোলই বাংলাদেশের শিরোপা নির্ধারণ করে দেয়।

রিপোর্ট পড়ে সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে খুশি আপাকে জানাল যে, তারা খেলাটা ভিডিওতে দেখতে চায়! খুশি আপা হেসে বললেন যে, খুবই ভালো প্রস্তাব! কিন্তু আমাদের তো সময় কম। আমরা পুরো খেলাটা সবাই একসঙ্গে ক্লাসে দেখতে পাবো না। তবে খেলার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আমরা ভিডিওতে সবাই একসঙ্গে শ্রেণিকক্ষে দেখতে পারি। এরপর তারা তুমুল উত্তেজনার সঙ্গে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১ এর ফাইনালে বাংলাদেশ বনাম ভারত ম্যাচটি উপভোগ করল।

ফুটবল খেলা নিয়ে মিল-অমিলের খেলা

খুশি আপা বললেন, এবার চলো আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। বাংলাদেশের মেয়েদের কেন সবাই সমর্থন করছি তা বোঝার জন্য দলে আলোচনা করব।

ক্লাসের সবাই ফুটবলার মেয়েদের সঙ্গে নিজেদের মিলে যাওয়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলছিল। তবে দেখা গেল, তারা ফুটবলার মেয়েদের সঙ্গে বেশ কিছু অমিলও খুঁজে পাচ্ছে।

আমরা আলাদা হলেও একই

খুশি আপা তখন সবাইকে বই থেকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় নারী ফুটবল দলের মেয়েদের ছবি দেখালেন। সবাই মারিয়া, আনাই, ঋতুপর্ণা, তহুরা, আঁখিসহ সবার সাথে পরিচিত হলো।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ নারী ফুটবল দল

সাফ অ-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১
চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ অ-১৯ মহিলা জাতীয় ফুটবল দলের নামের তালিকা

রূপনা চাকমা
গোলকিপার
রাঙ্গামাটি

ইয়াসমিন আক্তার
গোলকিপার
কুষ্টিয়া

ইতি রানী
গোলকিপার
মাগুরা

আঁখি খাতুন
ডিফেন্ডার
সিরাজগঞ্জ

শামসুন্নাহার
ডিফেন্ডার
ময়মনসিংহ

আনাই মগিনী
ডিফেন্ডার
খাগড়াছড়ি

নাসরিন আক্তার
ডিফেন্ডার
ঢাকা

নিলুফা ইয়াসমিন নিলা
ডিফেন্ডার
কুষ্টিয়া

আফঈদা খন্দকার
ডিফেন্ডার
সাতক্ষীরা

উন্নতি খাতুন
ডিফেন্ডার
ঝিনাইদহ

কোহাতি কিসকু
ডিফেন্ডার
ঠাকুরগাঁও

মারিয়া মান্দা
মিডফিল্ডার
ময়মনসিংহ

মনিকা চাকমা
মিডফিল্ডার
খাগড়াছড়ি

সোহাগী কিসকু
মিডফিল্ডার
ঠাকুরগাঁও

শাহেদা আক্তার রিপা
মিডফিল্ডার
কক্সবাজার

ঋতুপর্ণা চাকমা
মিডফিল্ডার
রাঙ্গামাটি

মার্জিয়া
ফরওয়ার্ড
ময়মনসিংহ

স্বপ্না রানী
ফরওয়ার্ড
ঠাকুরগাঁও

তহুরা খাতুন
ফরওয়ার্ড
ময়মনসিংহ

আনুচিং মগিনী
ফরওয়ার্ড
খাগড়াছড়ি

মোসাঃ হালিমা
আক্তার
ফরওয়ার্ড
ময়মনসিংহ

শামসুন্নাহার
ফরওয়ার্ড
ময়মনসিংহ

রেহেনা আক্তার
ফরওয়ার্ড
ঝালকাঠি

খুশি আপা শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করলেন ফুটবলার মেয়েদের সঙ্গে আমাদের বৈচিত্র্যগুলো খুঁজে বের করতে। সবাই দলে বসে খুব উৎসাহ নিয়ে ফুটবলার মেয়েদের পরিচয় পড়ে ও ছবি দেখে।

নাজিফা: চলো বন্ধুরা, ফুটবলার মেয়েদের সঙ্গে আমাদের কী কী মিল, অমিল আছে তা খুঁজে বের করি।

নাসির: হ্যাঁ, চলো আমরা একসঙ্গে খুঁজি। কাজের সুবিধার্থে চলো আমরা একটা মিল-অমিল ছক বানাই।

সবাই খুব খুশি হয়ে রাজি হলো এবং কী ধরনের মিল-অমিল তা বোঝার জন্য একটা ছক বানিয়ে ফেলল।

ছক: মিল-অমিলের ছক

বিষয়/বৈশিষ্ট্য	কী ধরনের মিল	কী ধরনের অমিল
জাতীয়তা		
সংস্কৃতি		
ভাষা		
ভৌগোলিক পরিচয়		
লৈঙ্গিক পরিচয়		
নৃগোষ্ঠী		
জাতীয় সংগীত		
জাতীয় পতাকা		
জাতীয় প্রতীক		

আমাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

আমরা আজ খুব মজার একটা কাজ করব। তার আগে চলো, আমরা সবাই নিচের ছবিগুলো দেখে নিই।

চাকমা

গারো

মারমা

সাঁওতাল

হাজং

মনিপুরী

তঞ্চঙ্গ্যা

বাঙালি

খুশি আপা: ছবিগুলো দেখে তোমাদের কার কী মনে হচ্ছে?

সুমন: এখানে আমাদের দেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষদের ছবি দেখা যাচ্ছে।

দীপা: হ্যাঁ, আমাদের নারী ফুটবলাররাও এরকম বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অন্তভূর্ক্ত।

খুশি আপা: তোমরা ঠিক বলেছ। চলো আজ আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করি।

ওমেরা, সিরাত, তাসপিয়া, মাহবুব, তাইফান ওরা সবাই দলে বসে গেল। ওরা বই থেকে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষের ছবি নিয়ে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করল। ওরা ঠিক করল, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের নামের সঙ্গে তাদের বিশেষ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সাজিয়ে একটা ছক বানাবে। দলে মিলে ওরা কাজ করল । পরে দলে আলোচনা করে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের মূল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা ছক বানিয়ে ফেলল। এরপর অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে ওরা আরও তথ্য সংগ্রহ করে ছক পূর্ণ করল।

ভাষার জন্য ভালোবাসা

খুশি আপা বললেন, তোমরা সবাই নিজের মাতৃভাষা ভালোবাস। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এই বইয়ের ‘আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ’ অধ্যায়ে তোমরা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবে। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাস আছে। তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তাদেরও মাতৃভাষার

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

জন্যে আমাদের মত দরদ আছে। তাই সবার উচিত নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সাথে সাথে অন্য ভাষার প্রতিও শ্রদ্ধা প্রর্দশন করা।

রবিন বলল, কিন্তু আমরা তো ওদের ভাষা জানি না।

তখন খুশি আপা বললেন, সেটাই হবে আজকে তোমাদের কাজ।

চলো আজ আমরা ভাষা নিয়ে কুইজ খেলব। দেখি কে সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর দিতে পারে। ক্লাসের সবাই খুশিতে চিৎকার করে উঠল, সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে কুইজের প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

খুশি আপা: কুইজের আগে চলো কুইজের বিষয়ের সাথে পরিচিত হব।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য হাত উঠাতে হবে। যে আগে হাত উঠাবে সে আগে উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবে।

প্রথম উত্তরদাতার উত্তর সঠিক না হলে, দ্বিতীয়জন উত্তর দেবে। এভাবে সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা উত্তর শুনে যাব।

কেউ যদি হাত না তুলে বা সুযোগ পাওয়ার আগেই উত্তর বলে বা কথা বলে, তাহলে তার মাইনাস মার্কিং হবে। যে বা যারা সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর দেবে, সে বা তারা আজকের কুইজের বিজয়ী হবে। সবাই বুঝতে পেরেছ? ক্লাসের সবাই একসঙ্গে বলল তারা বুঝত পেরেছে।

খুশি আপা প্রথমে বাংলায় নিজের কথাটা বললেন। তারপর একে একে বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় সেই কথাটিই শোনালেন। তোমরা শোন এবং পড়।

বলো:

বাংলা ভাষায়

আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশ। আমরা সবাই আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করবো।

চাকমা ভাষায়

আমার হোচপানার দেশ বাংলাদেশ। আমি বেগে আমার রীদিসুদোম বাজেই রাগেবং।

ককবরক (ত্রিপুরা) ভাষায়

বাংলাদেশ চিনি হামজাকমানি হা। চৌং যত্ত চিনি মুকুমু ন্ মা হিল ন্।

গারো ভাষায়

আঙ্গিংনি নাম্নিগবিগুবা আ'সং য়া বাংলাদেশ। আঙ্গিং প্লাক মান্দেরাং য়া আঙ্গিংনি দাকবেওয়ালকো রিপিং'না নাংনো।

কুইজে খুশি আপা বিভিন্ন ভাষায় প্রিয় দেশ, সংস্কৃতি, আমাদের, রক্ষা ইত্যাদি শব্দগুলো বলবেন। তোমাদের বলতে হবে খুশি আপার বলা শব্দটি কোন ভাষার? একটি করে শব্দ নিয়েই কুইজ বলবে।

রাস্তা চেনায় মানচিত্র

এতক্ষণ আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচয় সম্পর্কে জানলাম। এখন আমরা ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে জানব।

ক্লাসের বন্ধু রবি কয়েক দিন আগে একা একটি অচেনা জায়গায় বেড়াতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। মূল রাস্তা কোথায় জিজ্ঞাসা করায়, একজন বলল সোজা উত্তর দিকে যেতে। কিন্তু আকাশে মেঘ, বৃষ্টি হবে হবে অবস্থা, রবি দিক ঠিক করতে পারছে না। উত্তর দিক ভেবে চলতে চলতে দেখে সে চলে এসেছে একটা নদীর ধারে। তারপর অনেক কষ্টে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে অবশেষে সে সঠিক রাস্তা খুঁজে পায়।

ক্লাসে ফিরে রবি এসব কথা সবাইকে বলতেই খুশি আপা বললেন, আচ্ছা বলতো রবির কাছে কোন জিনিসটি থাকলে সে খুব সহজেই পথ চিনে বাড়ি চলে আসতে পারত?

সাকিব: রবির কাছে যদি ঐ এলাকার পথের একটা মানচিত্র থাকত তাহলে ও বুঝতে পারত কোন পথটা কোন দিকে গেছে।

মিলি: আমার বাবা যখন কোথাও অচেনা জায়গায় যান তখন তিনি তার মোবাইল ফোনে গুগল ম্যাপ দেখে দেখে রাস্তা চেনেন।

খুশি আপা: বাহ্ তোমরা তো অনেক কিছু জানো দেখছি। আচ্ছা, রবির কাছে যদি মানচিত্র না থেকে ওখানকার একটা ছবি থাকত, তাহলে ও কি পথ চিনতে পারত?

শিহাব: না আপা ছবি দেখে তো বোঝা যায় না কোন দিকে যেতে হবে!

খুশি আপা: ও আচ্ছা তাহলে তো মানচিত্রে অনেক কিছু থাকে। আচ্ছা চলো তাহলে দুটি ছবি দেখি–

প্রথম ছবি

দ্বিতীয় ছবি

প্রশ্ন:

- ১ম ও ২য় ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
- ছবি দুটির মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যাচ্ছে?

ওরা তখন দলে ভাগ হয়ে প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজতে চেষ্টা করল-

১ম ছবির উপাদান	২য় ছবির উপাদান
হাতে আঁকা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য	বাংলাদেশের মানচিত্র
গাছপালা, নদী	স্কেল, দিক

চলো ওদের মতো করে আমরাও ছবি দুটির উপাদানগুলো খুঁজে বের করি

মানচিত্র ও স্কেল

সানি: আপা, ছবির সঙ্গে মানচিত্রের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে পেলাম মানচিত্রে স্কেল লাগে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, স্কেল কেন লাগবে? আমরা ইচ্ছেমতো মাপে কেন তা আঁকতে পারব না।

খুশি আপা: চলো তাহলে আমরা একটা গল্প পড়ে আসি। খুঁজে দেখি গল্পে রাজা কী সমস্যায় পড়েছে?

রাজার আস্তাবল

অনেক আগে এক ঘোড়াপ্রেমী রাজকন্যা ছিল। রাজা ঠিক করলেন, তাঁর একমাত্র কন্যার জন্মদিনে তাকে একটা সুন্দর ঘোড়া উপহার দিয়ে চমক দেবেন। রাজা ঘোড়া কিনে আনার জন্য লোক পাঠালেন। লোকটি ঘোড়া আনলে রাজা সেটা জন্মদিন পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে বললেন। কিন্তু ঘোড়া রাখার জন্য তো একটা আস্তাবল চাই, তাই রাজা ঠিক করলেন তিনি নিজেই মাপ নিয়ে ছুতার (কাঠমিস্ত্রী) ডেকে আস্তাবল বানাবেন যাতে বেশি জানাজানি না হয়।

রাজা আড়াআড়ি আর লম্বালম্বি হেঁটে দেখলেন লম্বায় ২০ পা, পাশে ১০ পা হলে ঘোড়াটার জন্য উপযুক্ত আস্তাবল হবে। তখন তিনি ছুতারকে ডেকে আস্তাবল বানাতে বললেন যেটি ২০ ধাপ লম্বা এবং ১০ ধাপ চওড়া।

জন্মদিনে রাজকন্যা ঘোড়া উপহার পেয়ে বেজায় খুশি। যখন সে ঘোড়া রাখতে আস্তাবলে গেল তখন দেখে, ওমা, একি! আস্তাবল তো খুব ছোটো! রাজা বিরক্ত হয়ে ছুতারকে ডেকে পাঠালেন, জিজ্ঞেস করলেন এমন হলো কেন? ছুতার কিছুই বুঝতে পারছে না, সে বলল

রাজা মশাই আমি ঠিক ২০ পা লম্বা ও ১০ পা চওড়া আস্তাবলই বানিয়েছি। রাজা তখন ছুতারের পায়ের দিকে তাকিয়ে বিষয়টা বুঝতে পারলেন। রাজার পায়ের তুলনায় ছুতারের পা খুব ছোটো, মানুষও খাটো। আর তাই ছুতারের পায়ের মাপে বানানো আস্তাবল ছোটো হয়ে গেছে।

সানি বলল, এখন বুঝেছি আপা যদি আমি একটা নির্দিষ্ট মাপ না বলে দেই তাহলে সঠিকভাবে সেটার পরিমাপ বোঝা যাবে না। ফাতেমা বলল, হ্যাঁ যেমন, সানি যদি বলে ওর বাড়ি স্কুল থেকে ৫০ পা দূরে, তাহলে আমরা কেউ ই-বুঝতে পারব না ৫০ পা কি উত্তরে না দক্ষিণে নাকি অন্য কোনো দিকে। সাকিব বলল, আর ওর পা তো আমার থেকে ছোটো।

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ তোমরা। এ জন্য মানচিত্রে অনেক জরুরি জিনিস থাকে যা তোমরা আগে বের করেছ। নিঝুম বলল, মানচিত্রের নিচে যে স্কেল আছে তার প্রয়োজনীয়তা বুঝলাম, কিন্তু এটি কিভাবে কাজ করে আপা? খুশি আপা বললেন, চলো আমরা তোমার এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের শ্রেণিকক্ষটা মেপে দেখি।

তখন ওরা সবাই দুই দলে ভাগ হয়ে একদল শ্রেণিকক্ষের দৈর্ঘ্য এবং অন্যদল শ্রেণিকক্ষের প্রস্থ স্কেল দিয়ে মেপে নিয়ে এলো।

খুশি আপা: চলো এখন সবাই দলে বসে শ্রেণিকক্ষটি খাতায় আঁকি।

রবি: কিন্তু শ্রেণিকক্ষ তো অনেক বড়ো, এটা কীভাবে মাপ ঠিক রেখে খাতায় আঁকব?

নিঝুম: তাই তো। তাহলে কী করা যায়?

নাজিফা: আমরা যদি এটিকে একটু ছোটো কল্পনা করে নেই, তাহলে?

শফিক: তাহলে সেই রাজার আস্তাবলের মতো হবে কারণ এক এক জনের কল্পনা এক এক রকম হবে।

সাকিব: তাহলে আমরা যদি কল্পনা না করে ধরে নেই, খাতার ১ সেন্টিমিটারের সমান আমাদের কক্ষের ১০০ মিটার! তাহলে?

খুশি আপা: ঠিক তাই। কোনো স্থানের মানচিত্র আঁকার সময় নির্দিষ্ট মাপে ছোটো করে আঁকা যায়, তখন শুধু মানচিত্রে স্কেল আকারে পরিমাপটা লিখে দিতে হয়। চলো, আমরা সেভাবেই আমাদের শ্রেণিকক্ষে দলে ভাগ হয়ে খাতায় এঁকে ফেলি।

এখন ওরা দলে ভাগ হয়ে খাতায় শ্রেণিকক্ষের একটি মানচিত্র তৈরি করল।

বাড়ির কাজ

সবাই ঠিক করল, তারা সবাই বাড়ি থেকে নিজেদের স্কুলের পথের মানচিত্র এঁকে নিয়ে আসবে। শিমুল বলল, আমাদের বাড়ি থেকে স্কুল যদি ৭ কিলোমিটার হয় তাহলে আমি যে মানচিত্র আঁকব তার স্কেল ১ সে.মি. = ১ কিলোমিটার ধরব। খুশি আপা বললেন, বেশ বেশ তাহলে আমরা এভাবে সবার বাড়ি থেকে স্কুলে আসার পথের মানচিত্র এঁকে নিয়ে আসব।

চলো আমরাও ওদের মতো করে আমাদের বাড়ি থেকে স্কুলে আসার পথের মানচিত্র এঁকে ফেলি।

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র

চলো মানচিত্র তৈরি করি

নির্দেশনা:

১. কম্পাসের দিক চিহ্নিত করো
২. তোমার মানচিত্রে কমপক্ষে ৫টি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করো
৩. শিরোনাম লেখো
৪. স্কেল বসাও

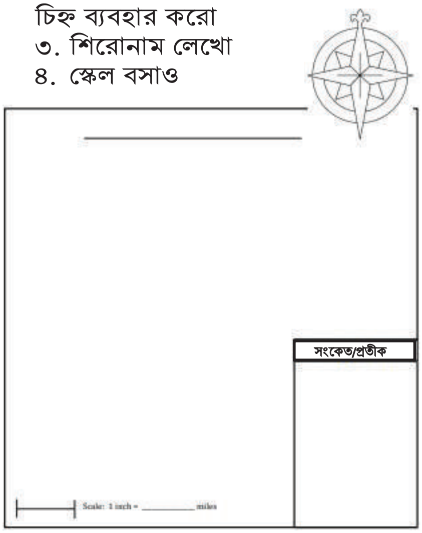

বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের পথের মানচিত্র

দীপার আঁকা বাড়ি থেকে স্কুলের মানচিত্র

খুশি আপা বললেন, তোমরা সবাই খুব সুন্দরভাবে মানচিত্র তৈরি করতে পেরেছ। এখন চলো আমরা একটা মজার কাজ করি। তোমরা তোমাদের বইয়ের এ পাঠে দেখো দুটো মানচিত্র ।

রবি বলল হ্যাঁ আপা, একটা বাংলাদেশের মানচিত্র আর একটি চট্টগ্রাম বিভাগের মানচিত্র। খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই। চলো এখন আমরা দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেকে চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান ভূমিরূপগুলো কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করি ও তা খাতায় লিখে ফেলি।

ওরা দলে ভাগ হয়ে কাজটি করা শুরু করল।

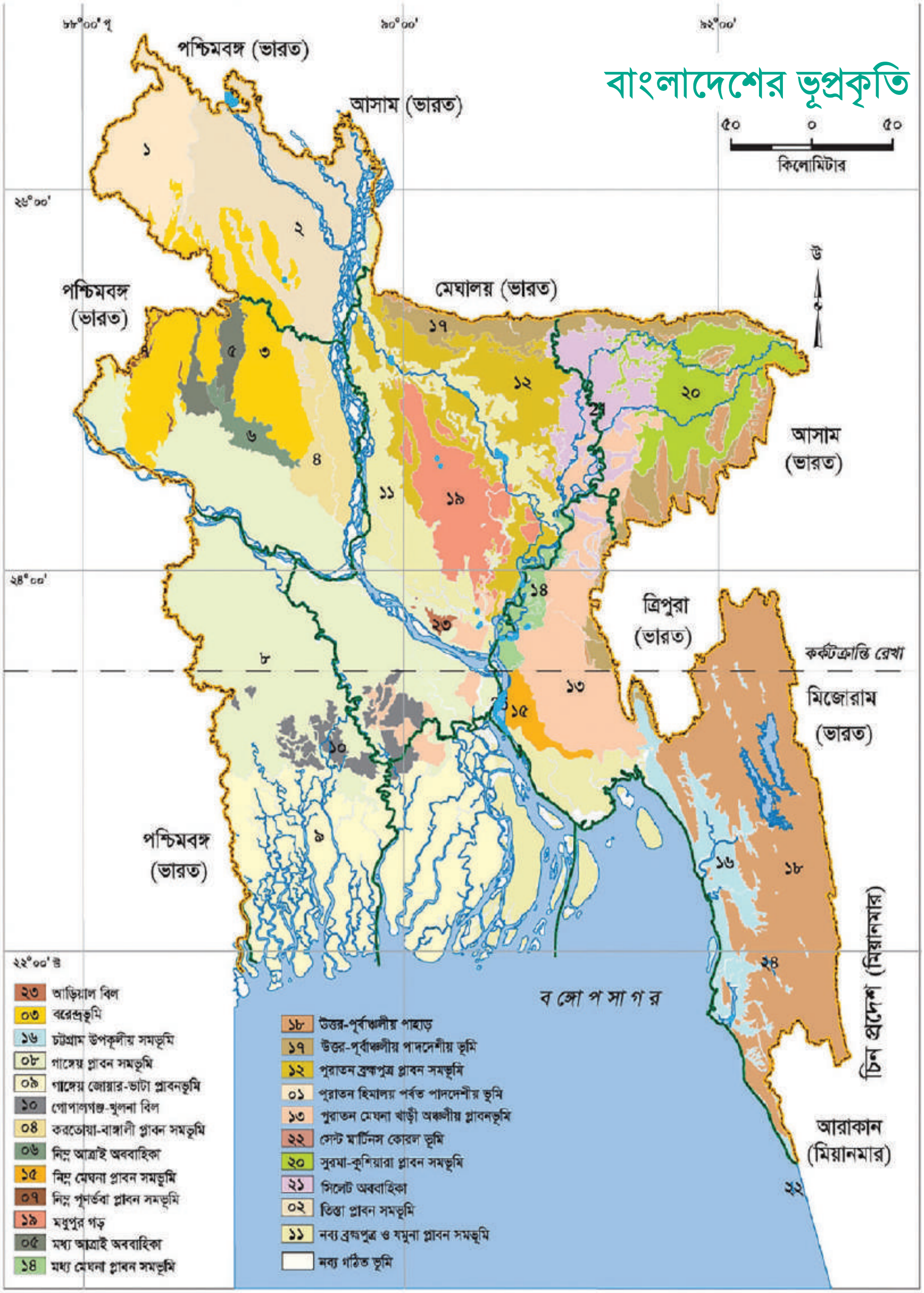

মানচিত্র সংগ্রহ– https://bn.banglapedia.org/index.php/

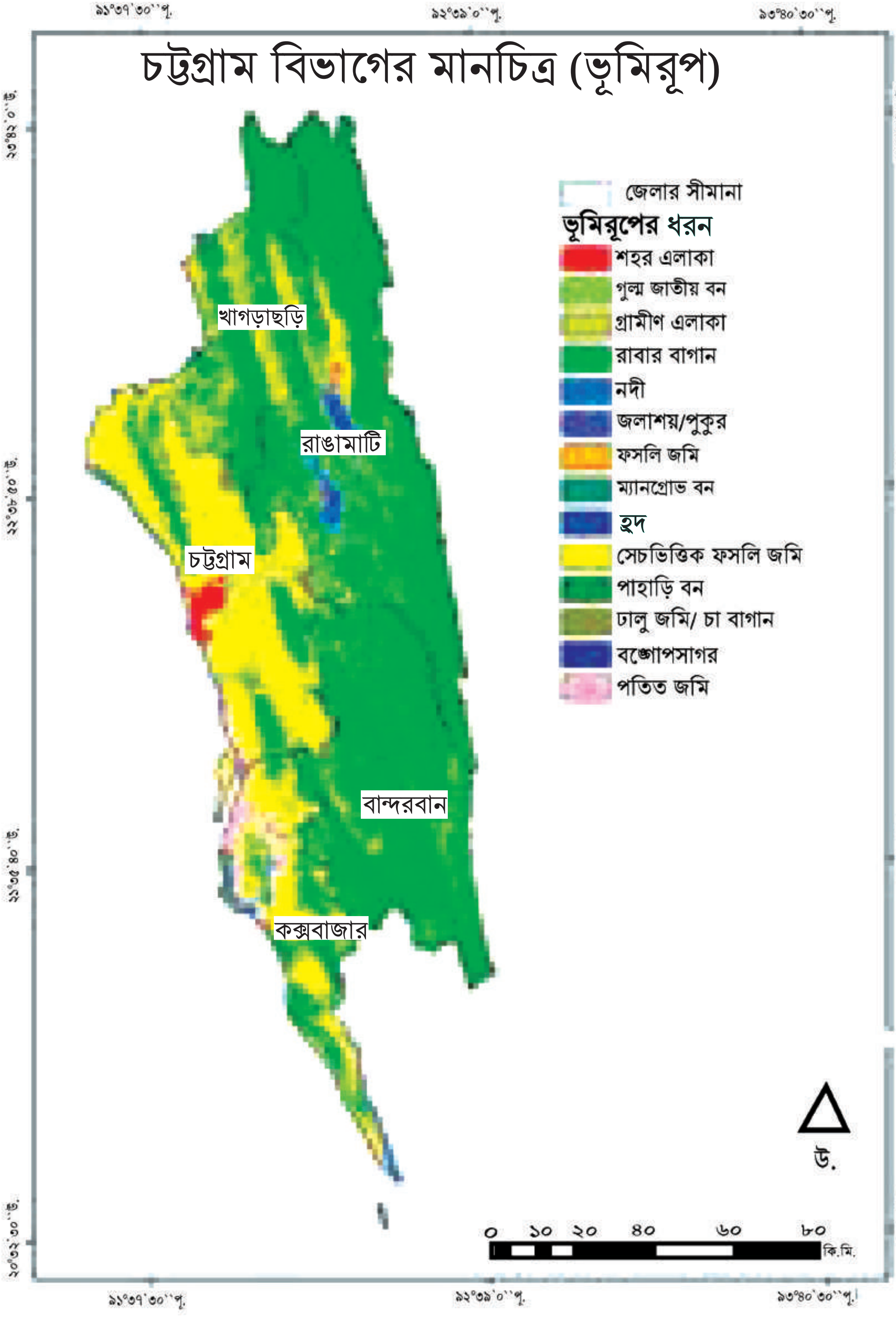
চট্টগ্রাম বিভাগের মানচিত্র (ভূমিরূপ)
খাগড়াছড়ি
রাঙামাটি
চট্টগ্রাম
বান্দরবান
কক্সবাজার
জেলার সীমানা
ভূমিরূপের ধরন
শহর এলাকা
গুল্ম জাতীয় বন
গ্রামীণ এলাকা
রাবার বাগান
নদী
জলাশয়/পুকুর
ফসলি জমি
ম্যানগ্রোভ বন
হ্রদ
সেচভিত্তিক ফসলি জমি
পাহাড়ি বন
ঢালু জমি/ চা বাগান
বঙ্গোপসাগর
পতিত জমি
উ.
০ ১০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০
কি.মি.

কাজটি শেষ হওয়ার পর ওরা যা যা খুঁজে পেয়েছে তা সব দল একে একে সবার সামনে উপস্থাপন করল।

খুশি আপা বললেন, আচ্ছা, এখন বলো কোন মানচিত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের ভূমিরুপ খোঁজার কাজটি সহজভাবে করতে পেরেছ? মিলি বলল, আপা যখন বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের ভূমিরূপ খোঁজার কাজ করেছি, তখন আমাদের ভূমিরূপগুলো কোথায় কোথায় আছে তা ভালোভাবে বুঝতেই পারছিলাম না। মনে হচ্ছে সব এক জায়গায় হয়ে গেছে।

সাকিব বলল, হ্যাঁ– আর যখন আমরা চট্টগ্রাম বিভাগের মানচিত্র নিয়ে কাজটি করলাম, তখন অনেক সহজেই তা খুঁজে পেয়েছি। খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই। এ জন্য যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে ভালোভাবে দেখতে হয় তখন তাকে একটু বড়ো করে নিলে কাজটি অনেক সহজ হয়, তাই না? তাসপিয়া বলল, যেমন আমরা ছবি বা মোবাইলে লেখা ছোটো থাকলে তাকে জুম করে দেখি, সেরকম কি আপা? খুশি আপা বললেন তুমি একদম ঠিক বলেছ তাসপিয়া। এভাবেই আমরা আমাদের প্রয়োজনে মানচিত্রকে ছোটো বা বড়ো করে দেখি। মিলি বলল, কী মজা আমরা মানচিত্রকেও জুম করতে পারি! সবাই ওর কথা শুনে হেসে উঠল। গণেশ বলল, কিন্তু আপা আমরা মানচিত্র কীভাবে ব্যবহার করতে পারি? খুশি আপা বললেন, ভালো প্রশ্ন করেছ। আমরা একটা মজার খেলার মাধ্যমে এটা বোঝার চেষ্টা করব।

খুশি আপা বললেন, আমরা আগামীকাল একটা গুপ্তধন খোঁজার খেলা খেলব। সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

গুপ্তধনের মানচিত্র

পরের দিন ক্লাসে সবাই খুব উত্তেজিত। সাকিব তো রীতিমতো গোয়েন্দা সেজে এসেছে। খুশি আপা ক্লাসে আসতেই মিলি বলল, আপা আমরা আজ সবাই গোয়েন্দা। খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ তাই তো। আজ আমরা যে গুপ্তধন খোঁজার খেলা খেলব তার জন্য কী কী লাগতে পারে? রনি বলল, সবার আগে লাগবে গুপ্তধন। রুপা বলল, আর অবশ্যই গুপ্তধন যেখানে থাকবে তার একটা মানচিত্র। সাকিব বলল, আর একটা মেধাবী গোয়েন্দা দল। সবাই ওর কথা শুনে হেসে উঠল। খুশি আপা বললেন, আচ্ছা এবারে সবাই আমরা খেলার নিয়ম ভালোভাবে শুনে নেই।

১ম ধাপে আমরা চারটা দলে ভাগ হয়ে যাব এবং আমাদের স্কুলকে চার ভাগ করে তার মানচিত্র আঁকব। যেমন একদল শ্রেণিকক্ষ থেকে স্কুলের খেলার মাঠ পর্যন্ত নিব, ২য় দল মাঠ থেকে লাইব্রেরি পর্যন্ত তার সীমানা ঠিক করবে। এভাবে বাকি দুটি মানচিত্রের এলাকা ঠিক করে চারটি পৃথক মানচিত্র এঁকে নেবো ।

২য় ধাপে আমি তোমাদের প্রতিটি দলের মানচিত্রে একটা × চিহ্ন দেবো যেখানে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখব।

৩য় ধাপে তোমরা প্রতিটি দল তাদের মানচিত্রটি অন্য দলের সঙ্গে বদলে নেবে।

৪র্থ ধাপে প্রত্যেক দল যে মানচিত্রটি পেয়েছ সেটি অনুসরণ করে গুপ্তধন খুঁজে বের করবে।

যে দল সবার আগে গুপ্তধন খুঁজে বের করে আনবে সে দল বিজয়ী।

সবাই বলল তারা বুঝতে পেরেছে। তারপর সবাই গুপ্তধন খোঁজার কাজে লেগে পড়ল।

পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র

আয়েশা আজ ভীষণ খুশি খুশি মুখ নিয়ে ক্লাসে ঢুকল। ওকে দেখে রবিন বলল, কী রে তোকে আজ এতো খুশি খুশি দেখাচ্ছে কেন? আয়েশা বলল, কারণ আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম। রবিন জিজ্ঞাসা করল, তা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলি?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আয়েশা বলল, কক্সবাজারে, কারণ আমার সাগর খুব ভালো লাগে। রবিন বলল, তাই? কিন্তু আমার বেশি ভালো লাগে পাহাড়। খুশি আপা ক্লাসে ঢোকার সময় ওদের কথা শুনে বললেন, আমার কিন্তু সাগর, পাহাড়ের সঙ্গে বনও খুব ভালো লাগে। সঙ্গে সঙ্গে অমিত বলল, আপা আমি সুন্দরবন দেখেছি, ওটা খুলনা বিভাগে। আনুচিং বলল, আপা আমার দাদু আগে থাকত বান্দরবানে। আমার ওখানকার পাহাড়, বন, ঝরনা সবকিছু খুব ভালো লাগে।

খুশি আপা তখন বললেন, আমরা তো প্রাচীন মানুষ কোথায় ছিল, কোথায় কোথায় গেছে সে বিষয়ে জানলাম। এখন চলো, আমরা নিজেদের নিয়ে এমন একটি কাজ করি।

সালমা বলল, কিন্তু আপা আমি তো জানি না এর আগে আমরা কোথায় ছিলাম! আপা বলল, ঠিক বলেছ।

তোমরাই বলো, এ কাজে তোমরা কাদের কাছ থেকে সাহায্য নিবে? সবাই বলল, বাড়ির বড়োদের।

রফিক বলল, আপা আমরা কোথায় কোথায় যেতে ভালোবাসি, সেটাও কি এখানে আনতে পারব?

আপা বললেন, নিশ্চয়। তোমরা এ কাজটি তোমাদের বইয়ে বাংলাদেশের যে মানচিত্রটি আছে সেখানে করবে। আমরা এ কাজটির কী নাম দিতে পারি? গণেশ বলল, এটি যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের পরিবার নিয়ে করতে হবে, তাই এর নাম হোক পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র। সবাই গণেশের মতকে সমর্থন করল।

তখন তারা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র তৈরি করল।

পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র

চলো, ওদের মতো করে আমরাও একটি পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র বানাই।

খুশি আপা আজ ক্লাসে সবার পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র দেখে ভীষণ খুশি হলেন এবং তাদের অভিনন্দন জানালেন। তারপর তাদের বললেন, তোমরা তো এখন জানো যে একজন মানুষের একটি মাত্র পরিচয় থাকে না। প্রত্যেকেরই অনেকগুলো পরিচয় তৈরি হয়। নিজেদের পরিচয়েরও বৈচিত্র্য তোমরা জেনেছ। বঙ্গবন্ধু, বেগম রোকেয়ার মতো মনীষীদের যে বহু বিচিত্র পরিচয় রয়েছে, তা-ও জেনেছ। তোমরা এতসব কাজের মাধ্যমে আরও যে পরিচয় সম্পর্কে জানলে তাকে বলে ভৌগোলিক পরিচয়। আপা বোর্ডে ভৌগোলিক পরিচয় কথাটি লিখলেন। মলি বলল, আপা আমরা তো বাংলাদেশের মানচিত্রে কাজটি করেছি, কিন্তু আমরা তো এশিয়া মহাদেশেও বাস করি। খুশি আপা বললেন, তুমি ঠিক বলেছ, চলো আমরা আরেকটি কাজ করি যেখানে তুমি কোন মহাদেশে আছ সেটিও থাকবে।

ওরা তখন বৃত্ত আকারের ছয়টি ছক পেপার নিল। সবচেয়ে বড়ো বৃত্তে নিজের মহাদেশ এবং ক্রমান্বয়ে নিজের দেশ, বিভাগ, জেলা, এলাকা ও সবচেয়ে ছোটো ছক পেপারে নিজের বাড়ির চিহ্ন দেবে।

আমি এখন মানচিত্রে

চলো আমরাও ওদের মতো করে কাজটি করি।

খুশি আপা বললেন, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জাতীয়তা, ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারলাম। চলো এখন আমরা সবাই মিলে আত্মপরিচয়ের মেলার আয়োজন করি। আমরা ৫-৬ জনের একটি দল গঠন করি। প্রতিটি দল তাদের আত্ম পরিচয় উপস্থাপনের জন্য যেকোনো একটি থিম নিয়ে কাজ করে মেলায় স্টল সাজাবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

থিমগুলো হলো:

১. খাদ্য
২. বস্ত্র
৩. বাসস্থান
৪. পেশা
৫. বিনোদন
৬. আচার-অনুষ্ঠান
৭. সংস্কৃতি
৮. অন্যান্য

আত্মপরিচয়ের মেলা শেষে খুশি আপা বললেন, আমরা হয়ত বুঝতে পারছি আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিন্নতা রয়েছে। আমাদের সবার আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন ইত্যাদি এক নয়। ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আমরা সবাই মিলেমিশে সম্প্রীতির বন্ধনে থাকছি। এই সম্প্রীতি আরো দৃঢ় হবে যদি আমরা আমাদের নিজেদের আত্মপরিচয় এবং অন্যের আত্মপরিচয়কে শ্রদ্ধা করতে পারি। অন্যের প্রতি সহনশীল আচরণ করতে পারি।

রিতা বলল, আপা আমরা কি দলে বসে নিজের ও অন্যের আত্মপরিচয়ের প্রতি করণীয় আচরণ ঠিক করতে পারি?

খুশি আপা বলল, অবশ্যই আমরা সবাই আগের মতো দলে ভাগ হয়ে যাই। প্রতিদল নিজের আত্মপরিচয়কে কিভাবে শ্রদ্ধা করব এবং অন্যের আত্মপরিচয়ের ভিন্নতার প্রতি কি ধরনের আচরণ করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করি।

চলো আমরাও দলে ভাগ হয়ে গিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ও অন্যের আত্মপরিচয়ের প্রতি করণীয় আচরণগুলো নিচের ছকে লিখে ফেলি।

নিজের আত্মপরিচয়ের প্রতি করণীয় আচরণ	অন্যের আত্মপরিচয়ের প্রতি করণীয় আচরণ

সক্রিয় নাগরিক ক্লাব

আজ ক্লাসে একটা আনন্দঘন পরিবেশ। সবাই বেশ আনন্দে আছে। গতদিন খুশি আপা বলে দিয়েছিলেন আজ ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসের সময়ে বিদ্যালয়ের মাঠে বা যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে সবাইকে নিয়ে ফুটবল খেলা হবে। শ্রেণিকক্ষে সবাই অধীর আগ্রহে তাই খুশি আপার জন্য অপেক্ষা করছে। কেউ কেউ ব্যাগে করে প্রিয় খেলোয়াড়ের ছবিও নিয়ে এসেছে। একটু পর পর বের করে সবাইকে দেখাচ্ছে। এসবের মধ্যেই হাতে আস্ত একটা ফুটবল নিয়ে হাসি মুখে খুশি আপা ক্লাসে ঢুকে পড়লেন। সবার মাঝেই বিরাট উত্তেজনা।

হাতের ইশারায় সবাইকে থামিয়ে, খুশি আপা বললেন, কি সবাই প্রস্তুত? সবাই সমস্বরে বলে উঠল, প্রস্তুত আপা।

তাহলে এসো আমরা দুটি দল গঠন করে ফেলি। প্রথমে আমরা সবাই মিলে চলো দুজন অধিনায়ক ঠিক করে নেই। তারপর আমাদের দুই অধিনায়ক তাদের দলের অন্য খেলোয়াড়দের বাছাই করে নেবো। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে দল গঠনের সময় ছেলে-মেয়ে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্নসহ সব ধরনের সক্ষমতার শিক্ষার্থীই কোনো না কোনো ভাবে যার যার সক্ষমতা অনুসারে খেলায় বা খেলার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

তখন শামীমা প্রস্তাব করল যে, নীলা আর গণেশ হতে পারে দুজন অধিনায়ক। অন্যদিকে মোজাম্মেল প্রস্তাব করল যে, ফ্রান্সিস আর রুপা হতে পারে দুজন অধিনায়ক। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল, এই চারজনের মধ্য থেকে কোন দুজন হতে পারে তাদের অধিনায়ক। আয়েশা বলে উঠল, আমরা ভোটের মাধ্যমে যে কোনো দুজনকে বাছাই করে নিতে পারি। তখন সবাই মিলে ভোট দিল এবং ভোটে নীলা আর গণেশ দুজন অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত হলো। এরপর নীলা আর গণেশ অন্য খেলোয়াড়দের দলে যুক্ত করে তাদের দল গঠন সম্পন্ন করল।

মাঠে গিয়ে খুশি আপা বললেন, আজ কিন্তু খেলা হবে অন্য রকমভাবে। আজ খেলায় কোনো নিয়ম থাকবে না। খেলোয়াড়রা যে যেমন ইচ্ছা তেমন করেই খেলতে পারবে। শুনে দুই দলের খেলোয়াড়রাই মহাখুশি হয়ে উঠল, এই ভেবে যে আজ আর গোলের হিসাব কেউ ঠিক করে রাখতে পারবে না। রেফারির দায়িত্ব পালন করছে তাদের ক্লাসেরই খাদিজা। খাদিজা বাঁশি বাজাতেই খেলা শুরু হয়ে গেল। তারপর ১৫ মিনিট ধরে তারা মহা উৎসাহের সাথে নিয়ম ছাড়া ফুটবল খেলার চেষ্টা করল। কিন্তু এতে আনন্দের চেয়ে ঝগড়া আর বিতর্কই বেশি হলো, কারণ ইচ্ছামত খেলতে গিয়ে এমন বিশৃঙ্খলা হলো যে এক পর্যায়ে খুশি আপাকে নিয়ম ছাড়া খেলার পর্ব শেষ করতে হলো। সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল এবং খুশি আপা বললেন, এসো এবার আমরা নিয়ম অনুযায়ী ফুটবল খেলি। তারপর তারা আবার নিয়ম-কানুন মেনে ফুটবল খেলল।

চলো ওদের মতো আমরাও ক্লাসের বন্ধুদের সাথে দুই দলে বিভক্ত হয়ে ফুটবল খেলি।

নিয়ম ছাড়া কোনো কিছুই কাজ করে না!

পরদিন ক্লাসে সবাই উত্তেজিত হয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে আলোচনা করছিল। খুশি আপা এসে বললেন, কাল যে আমরা ফুটবল খেললাম সেটা তোমাদের কেমন লেগেছে? সবাই সমস্বরে বলে উঠল, খুবই ভালো!!

খুশি আপা তখন বললেন, গতকাল আমরা দুই ভাবে ফুটবল খেলেছি, তাতে খেলায় কি কোনো পার্থক্য তৈরি হয়েছে? চিন্ময় বলল, আমিতো ভেবেছিলাম নিয়ম ছাড়া ফুটবল খেলার সময় এতো গোল হবে যে কোনো হিসাব রাখা যাবে না। কারণ সবাই হাত দিয়েই গোল দেবে। খাদিজা বলল, অথচ কোনো দলই একটাও গোল দিতে পারে নি। নিয়ম ছাড়া খেলতে গিয়ে একজন যখন বল হাতে নিয়ে দৌড় দিয়েছে অন্যরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ফলে এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে কেউ কোনো দিকে যেতে পারে নি। বারবার এই একই পরিস্থিতি তৈরি হওয়াতে নির্ধারিত সময়ে আর কেউ গোল করতে পারে নি। আসলে নিয়ম ছাড়া খেলায় চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়, শেষ পর্যন্ত আমরা খেলতেই পারি নি। চলো এবার আমরা ৫/৬ জনের গ্রুপে বসে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।

- নিয়ম কি শুধু খেলাতেই থাকে?
- আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নিয়ম দেখতে পাই? চলো তার একটি তালিকা তৈরি করি।
- কোথায় কী ধরনের নিয়ম রয়েছে?
- নিয়ম না থাকলে ঐসব ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

এরপর দলগুলো নিজেদের উত্তরগুলো বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে লিখে একটি তালিকা তৈরি করল এবং উন্মুক্ত আলোচনা শেষে সবাই উপলব্ধি করে যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নিয়ম এবং নিয়ম মানার গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্রই নিয়মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এবার চলো আমরাও বন্ধুদের সাথে মিলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি—

নিয়ম কি শুধু খেলাতেই থাকে?
উত্তর:____________________

আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নিয়ম দেখতে পাই? চলো তার একটি তালিকা তৈরি করি।
উত্তর:____________________

কোথায় কী ধরনের নিয়ম রয়েছে?
উত্তর:____________________

নিয়ম না থাকলে ঐসব ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?
উত্তর:____________________

এ পর্যায়ে শামিমা বলল, আচ্ছা, এবার বুঝেছি কেন আমাদের শ্রেণিকক্ষে, দিনের শুরুতে বিদ্যালয়ে ঢোকার সময়, টিফিনের সময়, ছুটির সময়সহ বিভিন্ন সময়ে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। নাসির বলল, তাহলে তো আমাদের শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়, পরিবার এবং সমাজে আচার-আচরণের নিয়ম তৈরি করা প্রয়োজন।

এরপর তারা দলে ভাগ হয়ে শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয়ে নিজেরা পালনের নীতিমালা তৈরি করল এবং তা শ্রেণিকক্ষে দৃশ্যমানভাবে টাঙিয়ে দিলো।

চলো আমরাও দলে ভাগ হয়ে শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয়ে নিজেরা পালনের নীতিমালা তৈরি করি এবং তা শ্রেণিকক্ষে দৃশ্যমানভাবে টাঙিয়ে দেই।

শ্রেণিকক্ষে অনুসরণের নিয়ম

১.

২.

৩.

....

....

বিদ্যালয়ে অনুসরণের জন্য নিয়ম

১.

২.

৩.

....

....

পরিবারে ও সমাজে অনুসরণের জন্য নিয়ম

১.

২.

৩.

....

....

তারা ঠিক করল যে, সারা বছর নিয়মগুলো তারা মেনে চলবে। যদি নতুন কোনো নিয়ম যুক্ত করার প্রয়োজন হয় তবে শ্রেণিকক্ষে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তা যুক্ত করা যাবে। একইভাবে কোনো নিয়ম অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলে তা বাদ দেওয়া যাবে। যত দিন তারা বিদ্যালয়ে থাকবে ততদিন পরবর্তী ক্লাসগুলোতেও এই নিয়মগুলো, প্রয়োজনে কিছু সংশোধন করে তারা অনুসরণ করবে। খুশি আপা আনন্দের সাথে জানালেন যে, তিনিও তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মগুলো মেনে চলবেন।

আদনান তখন বলল, কিন্তু বিদ্যালয়ে ও সমাজে তো আমরা শুধু একাই বাস করি না। আরও অনেক ধরনের মানুষ বাস করে। সবাই তো বিদ্যালয়ে এসব নিয়ম শেখার সুযোগ পায় নি। তারাও যদি নিয়ম মেনে না চলে তাহলে তো বিশৃঙ্খলা দূর হবে না। কিন্তু এতো মানুষকে নিয়ম পালনে উদ্বুদ্ধ করা খুবই কঠিন কাজ। এটা একা একা করা আমাদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং হবে। আনুচিং বলল, চলো তাহলে আমরা একটি ক্লাব তৈরি করি। সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য ক্লাব।

সবাই তার এ চিন্তাটাকে সমর্থন করল। রবিন বলল, তাহলে আমাদের ক্লাবের নাম হতে পারে সক্রিয় নাগরিক ক্লাব।

আনুচিং বলল, আমরা এই সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করতে পারব, তাই না আপা?

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ আনুচিং, আমরা সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করব। যেমন সামনের ক্লাসগুলো আমরা প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম এবং বই পড়া কর্মসূচি গ্রহণ করব।

এরপর খুশি আপা নিচের ছবিগুলো সবাইকে দেখিয়ে বললেন এর কোনগুলো নিয়ম মেনে চলার আর কোনো কোনগুলো নিয়ম ভাঙার আলোচনা করতে বলবেন।

এবার খুশি আপা সবাইকে কতগুলো ছবি দেখালেন

ছবি নিয়ে আলোচনা শেষ হলে তিনি বললেন যে, এগুলো তো শুধু ট্রাফিক নিয়ম মানা না মানার চিত্র। এসব ছাড়াও কাজের আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে।

এরপর শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের কাজ কী হবে তার তালিকা তৈরি করল। প্রতিটি দলের তালিকা উপস্থাপনের পর আলোচনার মাধ্যমে সবার সম্মতিতে ক্লাবের কাজ কী হবে তা শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত করে ফেলল।

তিনি আরও বললেন, কী কাজ করব তা তো ঠিক করা হলো, চলো এবার আমরা এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার সুবিধার্থে ক্লাবের একটি কমিটি গঠন করি। শিক্ষার্থীরা দলে বসে কমিটি সম্পর্কিত নিচের বিষয়গুলো আলাচনা করল—

- মোট সদস্য সংখ্যা,
- কী কী পদ/পদবি থাকবে,
- তাদের কার কী কাজ হবে
- সাধারণ সদস্য কারা হতে পারবে
- সাধারণ সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য কী থাকবে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এগুলোর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা প্রস্তাবনা তৈরি করল এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করল। সবাই মিলে আলোচনা করে একটা সাধারণ কাঠামো, অধিকার ও দায়িত্বের বিবরণী তৈরি করল। কমিটিতে তারা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করল।

এরপর শিক্ষার্থীরা নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন সম্পন্ন করল। নতুন কমিটি দ্রুতই তাদের প্রথম মিটিংয়ের তারিখ নির্ধারণ করে এবং প্রথম সভাতেই তারা কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দেয়।

সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন

আমরাও একটি সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন করি। সারা বছর ব্যাপী আমরা কি কাজ করব তার একটি পরিকল্পনা করে ফেলি।

সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের প্রথম কার্যক্রম হিসেবে খুশি আপা ট্রাফিক আইন নিয়ে ভাবার প্রস্তাব করলেন। শিক্ষার্থীরা সম্মত হলে তিনি সবাইকে তিনটি দলে বিভক্ত হবার আহ্বান জানান।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী-

- প্রথম দল উপযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বই থেকে, অন্যান্য উৎস থেকে ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করল।
- দ্বিতীয় দল ট্রাফিক নিয়মের প্রতীকগুলো সংগ্রহ করে পরিচিতি লিখল।
- তৃতীয় দল ট্রাফিক ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র তুলে ধরল। এ কাজে তারা আলোকচিত্র, আঁকা ছবি ব্যবহার করে বর্ণনা করল।
- নির্দিষ্ট দিনে তিনটি দলই নিজ নিজ সংগ্রহ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করল। এ সম্পর্কে অন্যরা মতামত দিয়ে সংশোধন বা পরিমার্জন সম্পর্কে পরামর্শ দিল।
- এভাবে তারা ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করল। বর্ণনাসহ ছবি ও ট্রাফিক সংকেতের একটি প্রদর্শনীও তারা আয়োজন করল।

দলগত কাজ-স্কুলে যাই নিরাপদে

আমরা যারা শহরে বাস করি না, তাদের রাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যাল হয়ত নেই। তাই ট্রাফিক সিগন্যাল মানতেও হয় না। আমরা শহরে বা গ্রামে যেখানেই বাস করি না কেনো চলো আমরা দলগতভাবে সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে বাসা থেকে নিরাপদে এবং স্বাচ্ছন্দে বিদ্যালয়ে যাবার জন্য কিছু নিয়ম নির্ধারণ করি। এই জন্য আমরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং এলাকার মানুষের কীভাবে সহায়তা পেতে পারি তা নিয়েও আলোচনা করি। আলোচনা করে আমরা আমাদের করণীয় বিষয় নির্ধারণ করি এবং সে অনুযায়ী কাজের পরিকল্পনা লিখে ফেলি।

ইতিহাস জানার উপায়

ইতিহাস আসলে কী?

ইতিহাস অনুসন্ধানে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। ইতিহাস খুবই আনন্দের পাঠ। ইতিহাস পাঠে মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড জানা যায়। অতীত না জানলে মানুষের কোনো বর্তমান থাকে না। মানুষের ভবিষ্যৎ তার বর্তমানের উপর নির্ভর করে। আর এই বর্তমান গড়ে ওঠে অতীতে মানুষের অর্জিত নানান অভিজ্ঞতার উপর। ইতিহাস তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে তোমাদের দাদা-দাদি, নানা-নানি ছাড়াও অনেক অনেক বছর আগে ছিলেন তাদেরও পূর্বসূরিরা। এই যে হাজার হাজার বছর ধরে পূর্বসূরিরা এই পৃথিবীতে ছিলেন, তাদের নানান কাজকর্ম বা জীবনধারার ধারাবাহিক বর্ণনা যখন তোমরা নির্ভরযোগ্য উৎস ও প্রমাণের আলোকে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা ও বুঝার চেষ্টা করবে তখনই তা ইতিহাস হয়ে উঠবে। মানুষ লক্ষ বছর ধরে কীভাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, কৃষি ও নগর বিপ্লব ঘটিয়েছে, ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম উদ্ভাবন করেছে, রাজ্য-রাষ্ট্র নির্মাণ করে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে তা ইতিহাস পাঠেই জানা যায়।

ইতিহাস পাঠ

৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ইতিহাসের বেশ কয়েকটি মজার পাঠ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। নিজেকে জানার জন্য, নিজের পরিবার, সমাজ, দেশ আর মানুষকে জানা ও বুঝার জন্য ইতিহাসের এই পাঠগুলো তোমাদেরকে সাহায্য করবে।

ইতিহাস জানব কেমন করে?

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেছেন খুশি আপা। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের একটা গল্প বলি। গ্রামের মাঠে একদল ছেলে-মেয়ে ক্রিকেট খেলছিল। মাঠের পাশেই একটা জঙ্গল। মাইকেলের বলে সাকিব এমন জোরে ছক্কা মারলো যে বল জঙ্গলে হারিয়ে গেল। সালমা গেল জঙ্গলে বল খুঁজতে। দেরি দেখে অন্যরাও ঢুকে পড়লো। তারা বল খুঁজছে তো খুঁজছেই। বলটা তো আর পাওয়া যাচ্ছে না। গহীন অরণ্য। এদিকে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। আলোও কম। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো রেনু'র চিৎকার- 'সবাই জলদি এদিকে এসো! এখানে বড়ো একটা ঢিবি আর পুরানো দালান-বাড়ি দেখা যাচ্ছে! বলটা মনে হয় এখানেই হারিয়েছে!'

মাইকেল আর সাকিব বলল, 'চলো সবাই, ওখানে গিয়ে বলটা খুঁজি।'

তখন শাতিল ও রাব্বি বলল, 'ওখানে কে না কে থাকে জানি না। যদি আমাদের মারে! আটকে রেখে দেয়!'

রেনু'র সাহস দেখে মনীষা এগিয়ে গেল। বাকিরাও পৌঁছে গেল ঢিবিটার সামনে। রেনু ততক্ষণে ওই ভাঙা দালানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বাকিরাও এক এক করে প্রবেশ করল।

ভাঙা দালানের একটা ঘরে ওরা খুঁজে পেল কয়েকটা ভাঙা চেয়ার, একটা ভাঙা টেবিল, আর ছড়ানো ছিটানো পুরানো কিছু কাগজপত্র। ভাঙা টেবিলটার এক কোণে কয়েকটা অপরিচিত মুদ্রা। পাশের ঘরে ঢুকে তারা দেখতে পেল একটা মাটির কলসি, মাটির পাত্রের কতগুলো ভাঙা টুকরা, কয়েকটা টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলক। আর ঘরটির এক কোণে কতগুলো তালপাতা যার উপরে অচেনা ভাষার লেখা। লেখাগুলো ওরা পড়ার চেষ্টা করল।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দেখতে অনেকটাই বাংলা অক্ষরের মতো। কিন্তু কোথায় যেন অমিল রয়েছে। বেশ প্যাঁচানো, লাল কালিতে সুন্দর করে লেখা। ঘরের দেয়ালে আঁকা ছবি। খোদাই করা কারুকাজ। ওরা আরও দুটো ভাঙা ঘরে ঢুকলো। সেগুলোতে ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে মেঝেতে। রুমের পাশেই ঢিবিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বহুদিন ধরে আস্তে আস্তে কিছু একটা মাটি চাপা পড়ে আছে। দু/একটা বড়ো গাছ জড়িয়ে অনেক লতা-গুল্ম। গোধূলির আভা একটা বিশেষ রং ছড়িয়ে দিয়েছে পুরানো ভাঙা দালান আর ঢিবিটার উপর। সন্ধ্যা নামছে। ওদের এবার কিছুটা ভয় করতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে ভাঙা দালানটার ভেতরে ও বাইরে সাপ আর বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে! ক্রিকেট টিমের প্রায় সকলেরই মনটা খারাপ। অনেক খুঁজেও ওরা বলটা পেল না ওই ভাঙা দালানে। কিন্তু পুরানো দালান, ঢিবি আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানান জিনিসপত্র রেনুকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। অন্যরাও খানিকটা কৌতুহল নিয়ে যার যার বাসার দিকে রওনা হলো।

বাসার পথে হাঁটতে হাঁটতে রেনু'র মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দিল: এই দালান কতোদিনের পুরানো? কারা থাকতেন ওখানে? যারা থাকতেন তারা চলে গেলেন কেন? তালপাতার পুঁথি এখানে এলো কীভাবে? তালপাতায় কী লেখা ছিল? মাটির পাত্র আর পোড়ামাটির ফলকগুলোই বা কতো পুরানো? ওই মাটি চাপা পড়া ঢিবিটার নিচে কি কোনো গুপ্তধন থাকতে পারে?

এমন হাজারটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকলো। বন্ধুদের সাথে কথা বলে রেনু স্কুলের হেড স্যারকে সবকিছু খুলে বলল। স্যার তো ওদের সাহস ও বুদ্ধি দেখে খুব অবাক হলেন। ওদের সবাইকে তিনি বললেন, 'তোমরা তো বিরাট আবিষ্কার করেছ। আমরাও তো জানি না যে জঙ্গলের মধ্যে কোনো ইতিহাস লুকিয়ে আছে।'

হেড স্যার একজন ইতিহাসবিদকে স্কুলে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। স্যারের পরামর্শে শিক্ষার্থীরা তাদের কৌতূহলী প্রশ্নগুলো এক এক করে উত্থাপন করল।

ইতিহাসবিদ বললেন, ‘তোমাদের মনে অনেক প্রশ্ন। এটা ইতিহাস জানার প্রথম ধাপ।’ তিনি বলে চললেন, ‘ভাঙা দালানটি বেশ পুরানো। কত পুরানো তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বোঝা যাবে। তবে তোমাদের কাছে ঢিবির অস্তিত্বের কথা শুনে বুঝলাম দালানটার বয়স অবশ্যই একশো বছরের অধিক। আর তোমরা যেসব সামগ্রী দেখেছো সেগুলোর সবই ইতিহাসের উৎস বা উপাদান। এমনও হতে পারে, ওই দালানে যিনি বা যাঁরা থাকতেন তাঁরা নিশ্চয়ই প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে পড়ালেখা করতেন। গবেষণা করতেন। বিভিন্ন উৎস যাচাই-বাছাই আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কীভাবে ইতিহাস রচনা করতে হয় তা তাঁরা জানতেন। পুরানো তালপাতার লেখা, মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরা, টেরাকোটা থেকে তিনি বা তাঁরা হয়ত পুরানো সময়ের বিভিন্ন ঘটনা জানা ও লেখার চেষ্টা করতেন। কোনো এক প্রাকৃতিক/ ভৌগোলিক দুর্যোগে পড়ে বাড়িটি হয়ত পরিত্যক্ত হয়েছে।’

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে শতক ও দশকের হিসাবে বলতে চাইলে বলতে হবে, বিশ শতকের সত্তরের দশকের ঘটনা। একইভাবে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন হচ্ছে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর জন্মসাল ১৯২০ হচ্ছে বিশ শতকের বিশের দশকের ঘটনা। আর ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধ হচ্ছে আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশকের ঘটনা।

সময় সংক্রান্ত আলাপে আরও একটি বিষয় আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। ইংরেজি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের গণনা শুরু হয়েছে যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যিশু হলেন খ্রিষ্টধর্মের প্রধান ব্যক্তিত্ব। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের হাজার হাজার বছর আগেও তো পৃথিবীতে মানুষ ছিল, মানুষের নানান কর্মকান্ড ছিল। বিভিন্ন বইপত্রে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, সেই সময়কে চিহ্নিত করা হয় খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ দিয়ে। তাহলে তোমরা বুঝলে ইতিহাসে কেনো খ্রিষ্টাব্দ আর খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ শব্দ দুটো ব্যবহার করা হয়।

বাংলা কিংবা বাংলাদেশ নামে পরিচিত হবার আগেও এই ভূমির অন্য অনেক নাম ছিল। বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড়, সমতট, হরিকেল নামেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এর ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। নানান সময়ে নানান নামে পরিচিত হলেও বাংলা নামে ভূখণ্ডটির রয়েছে অভিন্ন কিছু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমানাবেষ্টনী। ভৌগোলিকভাবে একটি সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বসবাসের কারণেই এখানকার মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক বন্ধন। আর এই স্থান পেয়েছে একটি ‘অঞ্চল’ হিসেবে স্বীকৃতি।

ইতিহাস জানা কেন দরকার?

অনেকে তোমাদেরকে বলতে পারেন, অতীতের কথা ভুলে যাও। ইতিহাস জেনে কোনো লাভ নেই। ইতিহাস জেনে টাকা-পয়সা পাওয়া যায় না। কিন্তু তারা ভুল বলেন। ইতিহাস জানা যেকোনো মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজন। চলো একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করি।

আমাদের পাড়া/ মহল্লা/ গ্রামের ইতিহাস খুঁজি

আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পাড়া, মহল্লা বা গ্রামে বসবাস করি। এগুলোর প্রতিটির রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস। চলো, আমাদের নিজ নিজ পাড়া, মহল্লা বা গ্রামের ইতিহাস জানার চেষ্টা করি। এজন্য আমরা পাড়া, মহল্লা বা গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করব।

আমরা ৫-৬ জনের দল গঠন করি। লক্ষ্য রাখব যেনো দলের সবাই একই পাড়া/মহল্লা/গ্রামের হয়।

প্রতিদল কিছু প্রশ্ন তৈরি করবে পাড়া/মহল্লা/গ্রামের ইতিহাস জানার জন্য। তারা দলগতভাবে ৪-৫ জন বয়স্ক ব্যক্তি নির্ধারণ করবে যারা তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পূর্বে আমাদের কিছু বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

উত্তরদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া

১. কতক্ষণ সময় লাগতে পারে তা উত্তরদাতাকে জানাতে হবে।

২. কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা জানাতে হবে।

৩. উত্তরদাতাকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কোনো রকম চাপ দেওয়া হবে না তা জানাতে হবে।

৪. যেকোনো প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার জন্য তিনি স্বাধীন সেটা জানাতে হবে।

৫. উত্তরদাতার যেকোনো ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, বয়স ইত্যাদি) গোপন থাকবে তা জানাতে হবে।

৬. প্রাপ্ত তথ্য শুধুমাত্র এই কাজেই ব্যবহৃত হবে তা জানাতে হবে।

কোনো মানুষ যদি তার ও তার মতো অন্যান্য মানুষ আর প্রকৃতির ইতিহাস না জানেন, তাহলে বর্তমানে সেই মানুষের বা মানুষদের কোনো নিজস্ব পরিচয় থাকবে না। আমাদের দেশ, জাতি ও মানুষের অতীত স্মৃতি জানা দরকার। মানুষের যদি স্মৃতি না থাকে, তাহলে সেই মানুষের বেঁচে থাকা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। ইতিহাস কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী সকল মানুষের সমষ্টিগত স্মৃতির যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা। মনে রাখবে, ইতিহাস আমাদের সকলের সম্মিলিত স্মৃতিকে খুঁজে বের করে। আমরা অতীতে যদি কোনো ভুল করে থাকি, কোনো খারাপ কাজ করে থাকি তা জানলে ভবিষ্যতে সেই ভুল বা খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারি। আর যদি মানুষ ও মানবতার পক্ষে অহংকার করার মতো ভালো কাজ করি, তাহলে সেই কাজ ইতিহাসে প্রেরণা জোগাবে। তাই অতীত থেকে বর্তমানের পরিবর্তনের ধারাটি কেমন এবং এই পরিবর্তনের ধারাটি ভবিষ্যতকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে সেই সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি ইতিহাস থেকে। বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে আন্তঃসম্পর্কের জন্যও আমাদের ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি

আমাদের বন্ধু 'নাসির' ও 'আয়েশা'

তোমরা কি নাসির ও আয়েশাকে চেনো? তাদের আরও বন্ধু আছে। আমরা তাদের সাথেও ধীরে ধীরে পরিচিত হবো। নাসির আর আয়েশা যা কিছু দেখে, শোনে তা নিয়েই ভাবে, মনে নানা প্রশ্ন আসে। তোমরাও নিশ্চয় তা-ই করো। তারা তোমাদের মতোই ক্লাসের অন্য বন্ধু, শিক্ষক, পরিবারের সদস্য আর প্রতিবেশীর সাহায্য নিয়ে বই পড়ে, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। আর এটাই তাদের পড়ালেখা। কী দারুণ ব্যাপার, তাই না? চলো তাদের সাথে আমরাও যুক্ত হই ক্ষুদে অনুসন্ধানীর দল হিসেবে।

ছবি নিয়ে আলোচনা

আজ নাসির ও আয়েশা একটি ছবি খুঁজে পেয়েছে। এটি বুড়িগঙ্গা নদীর ছবি। নদীটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলেছে। কিছুদিন আগেই তারা বুড়িগঙ্গা নদীতে বেড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু ছবির বুড়িগঙ্গা আর তাদের কিছুদিন আগের দেখা বুড়িগঙ্গার মধ্যে অনেক পার্থক্য। কেন? এই তাদের আজকের চিন্তার বিষয়। তোমরা দেখো তো তাদের একটু সাহায্য করতে পার কিনা?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চিত্র: বুড়িগঙ্গা নদী

চিত্র: বুড়িগঙ্গা নদী

প্রশ্ন

ক) ছবি দুটিতে কী কী আছে?

খ) কোনো পার্থক্য কি আছে?

গ) কোন ছবিটি তুলনামূলকভাবে আগের? কোনটি সাম্প্রতিক?

ঘ) তোমাদের কী মনে হয়, কেন এই পার্থক্য?

ক্লাসের শিক্ষক খুশি আপা তাদের আরও কিছু ছবি দেখালেন

চিত্র: পদ্মা নদী

চিত্র: পদ্মা নদী

চিত্র: ঢাকার গণপরিবহণ

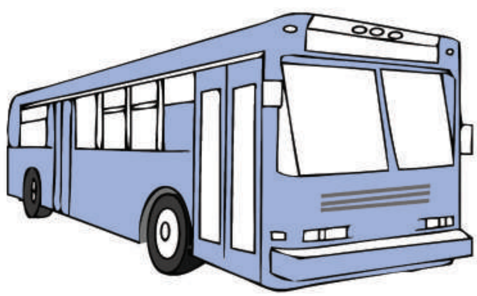

চিত্র: ঢাকার গণপরিবহণ

এই সব ছবির মধ্যে কোনো মিল রয়েছে কি?

এগুলো কি কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

ছবিতে যেসব বাহন দেখা যাচ্ছে সেগুলো ব্যবহারের উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করো।

আমাদের এলাকার পরিবর্তন

নাসির আজ দৌড়ে চলে এলো স্কুলে আর আয়েশাকে বলল: দেখো দেখো আমাদের গ্রামের পুরানো এক ছবি।

আয়েশা: কিন্তু এটি কোন জায়গা? এ রকম জায়গা তো চোখে পড়েনি আমাদের গ্রামে।

নাসির: হ্যাঁ, আমিও চিনতে পারছি না।

আয়েশা: চলো সুরেশ কাকার কাছে যাই। কাকার বয়স ৭০ এর বেশি। আগের অনেক কিছুই উনি জানেন, ওনার স্মৃতিশক্তিও ভালো, আগের অনেক কথা মনে করতে পারেন।

দুই বন্ধু পাশের বাসার সুরেশ কাকার কাছে গেল। ওনার কথা শুনে তারা তো অবাক। এটা নাকি তাদের স্কুলের উত্তর পাশের সেই জায়গা যেখানে এখন বড়ো একটি কারখানা গড়ে উঠেছে। আর দেরি না করে বিকেলেই তারা আয়েশার মাকে নিয়ে সেই জায়গাটিতে গেল। তারা আয়েশার মায়ের ফোন ব্যবহার করে জায়গাটির ছবি তুলে নিল।

পরের দিন শ্রেণিকক্ষে সবাই ছবি দুটোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ল!

বর্তমানের ছবি

আগের ছবি

দীপা বলল: এই কারখানায় চিপস বানায়।

দীপঙ্কর বলল: এজন্যই তো এখন এখানে এতো আলুর চাষ হয়।

মিলি বলল: আগে কি আলুর চাষ হতো না?

দীপা বলল: আমার দাদার কাছে শুনেছি আগে ধান চাষ হতো বেশি।

নাসির বলল: আগে অনেক কিছুই অন্যরকম ছিল। আমার নানি বলেছে তখন বিদ্যুৎ ছিল না। টিভি ছিল না। কম্পিউটার, গেমস, মোবাইলও ছিল না।

মিলি: হ্যাঁ, কিন্তু তখনও তারা অনেক মজার মজার খেলায় মেতে থাকত। সেগুলো আমরা এখন খেলি না। আমি এই বিষয় নিয়ে আরও জানার চেষ্টা করব ভাবছি।

দেখা গেল ক্লাসের সবাই কম-বেশি নিজ নিজ এলাকার বিভিন্ন পরিবর্তনের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী। কেউ জানতে চায় খেলা নিয়ে, কেউ জামা কাপড়, কেউ পোশাক পরিচ্ছদ, কেউ যাতায়াত ব্যবস্থা, কেউ কৃষি, কেউ ভূপ্রকৃতি, কেউ জলবায়ু, কেউ খাবার-দাবার, এরকম কত কী জানার আগ্রহ তাদের!

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন

সব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে তারা গেল বিদ্যালয়ে। খুশি আপা সব শুনে বললেন– তাহলে চলো, শুরু করে দেই তোমাদের প্রশ্নের উত্তর খোঁজা, শুরু হোক অনুসন্ধান। প্রথমে এসো প্রত্যেকের এলাকার দৃশ্যমান পরিবর্তনগুলো নিয়ে যার মাথায় যে প্রশ্ন আসছে তা চটপট লিখে ফেলি।

আমার এলাকার পরিবর্তন নিয়ে যে প্রশ্নের উত্তর আমি জানতে চাই:

১. আগে এই এলাকার ছেলে-মেয়েদের কী কী করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাটত? এখন আমরা যা যা করি তার থেকে কি ভিন্ন ছিল? কতটা ভিন্ন?

২. আগে যখন কারও বাসায় ফ্রিজ ছিল না তখন আমাদের এলাকায় খাবার কীভাবে সংরক্ষণ করা হতো?

চলো আমরাও আমাদের এলাকার পরিবর্তন বিষয়ে প্রশ্ন লিখি

১. ______________________________

২. ______________________________

প্রশ্ন বাছাই

এবারে খুশি আপা বললেন, চলো আমরা ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে বসি। প্রত্যেকে নিজেদের লেখা প্রশ্নগুলো বন্ধুদের জানাই। প্রশ্নগুলো থেকে আমরা এমন সব প্রশ্ন বেছে নেবো যেগুলোর উত্তর আমরাই নানা উপায়ে খুঁজে বের করতে পারি।

সব প্রশ্ন কি অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত?

আয়েশা বলল, আমি জানতে চাই কবে আমাদের এই বিদ্যালয়টি তৈরি হয়েছিল?

বুশরা বলল, প্রধান শিক্ষক সেদিন এক বক্তৃতায় বলেছিলেন ১৯৯০ সালে আমাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা তো আমরা জানিই। তুমি কি এটাই আবারো জানতে চাও? নাকি বিদ্যালয়ের কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চাও?

আয়েশা বলল, নাহ বুশরা, তুমি ঠিকই বলেছ। যেসব প্রশ্নের উত্তর আমরা বন্ধুরা জানি বা যেটা জানার জন্য কোনো খোঁজাখুঁজি বা অনুসন্ধানেরই দরকার নেই, সেই প্রশ্ন বাদ দেই। বরং আমি এটা জানতে চাইতে পারি যে অনেক আগে বিদ্যালয়টা কেমন ছিল?

এবারে মুনিয়া বলল-আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে আমাদের পূর্ব দিকের নদীর নিচে বা তলায় কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? বাইরেরটা তো দেখা যায় সহজেই, কিন্তু তলারটা জানব কীভাবে?

আয়েশা বলল: আগে তুমি বড়ো হয়ে দক্ষ ডুবুরি হও, তারপর না হয় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাবে।

মুনিয়া বলল: ঠিকই বলেছ। এই প্রশ্নটি আপাতত তুলে রাখি ভবিষ্যতের জন্য। এবার অন্যদেরও এরকম প্রশ্ন বের হলো যেগুলোর অনুসন্ধান করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়- হয়ত অনেক দূরে যেতে হবে নয়ত কাজটা নিরাপদ নয়, অথবা অনেকের সাহায্য দরকার হবে, কিংবা অনেক খরচের ব্যাপার আছে।

প্রতিটি প্রশ্ন এভাবে বিশ্লেষণ করে তারপর তালিকা চূড়ান্ত করল ওরা।

চলো এভাবে আমরাও প্রশ্নের তালিকা চূড়ান্ত করি।

আমাদের প্রশ্নগুলো কি অনুসন্ধানের উপযোগী? চলো মিলিয়ে দেখি (✓/ × দেই)

প্রশ্ন	প্রশ্নটির উত্তর আমরা এখনো জানি না	প্রশ্নটির উত্তর জানার আগ্রহ আমাদের আছে	প্রশ্নের উত্তর পেতে কী করতে হবে, কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে তা বুঝতে পারছি	প্রশ্নটির উত্তর পেতে যা করা দরকার তা আমরা করতে পারব	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব
১					
২					

যে প্রশ্নগুলো উপরের সব বৈশিষ্ট্যই পূরণ করবে আপাতত সেগুলোই আমরা চূড়ান্ত তালিকায় রাখলাম।

চূড়ান্ত প্রশ্নের তালিকা তৈরি

চলো এবারে সবাই দলে বসি এবং প্রশ্নগুলো দলের বন্ধুদের একবার পড়ে শোনাই। এবারে প্রশ্নের চূড়ান্ত তালিকা একটি পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে দেই। এখন বাছাইকৃত প্রশ্নের তালিকা থেকে প্রত্যেক দল আগ্রহ অনুযায়ী একটি করে প্রশ্ন বেছে নেবো। এরপরে প্রতিটি দলের কাজ হলো-প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।

অনুসন্ধানের পরিকল্পনা ও তার উপস্থাপন

দলের নাম:

দলের সদস্যদের নাম:

১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন:

২। প্রশ্নের ভেতরে যে মূল বিষয়গুলো রয়েছে: (key concepts):

৩। কোথায় বা কার কার কাছে গেলে প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা যাবে:

৪। কিভাবে বা কী উপায়ে জানা যাবে:

চলো প্রত্যেক দলই প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ছকটি পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের সবার সাথে ভাগ করে নেই। এক দল আরেক দলের উপস্থাপনা থেকে পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ বোঝার চেষ্টা করব। প্রথমে তাদের পরিকল্পনাটির ভালো দিকগুলোর প্রশংসা করব, তারপর যে সকল বিষয়ে পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হবে সেসব বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পরিকল্পনার বিচার- বিশ্লেষণ

অনুসন্ধানের ধাপ	বিচারের মানদণ্ড	উদাহরণ
১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন	● উপরের প্রশ্ন বাছাইয়ের ছকটি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের জন্য উপযোগী প্রশ্ন তৈরি করব। লক্ষ্য রাখতে হবে উত্তরগুলো যেনো ১/২ সপ্তাহের মধ্যেই পেয়ে যাই।	আগে এই এলাকার মানুষ কী ধরনের খাবার খেতো আর এখন কেমন খাবার খায়? অথবা এভাবেও প্রশ্নটিকে লেখা যায়- অতীত ও বর্তমানে আমাদের এলাকার খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন হয়েছে কি? হয়ে থাকলে কী পরিবর্তন হয়েছে?
২। প্রশ্নের মধ্যে থাকা মূল বিষয়গুলো (key concepts)	● প্রশ্নের মধ্যে সর্বোচ্চ দুটি মূল বিষয় থাকবে। ● বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট হবে।	অতীতকালের খাদ্যাভ্যাস ↔ বর্তমান কালের খাদ্যাভ্যাস
৩। কোথায় বা কার কাছে গেলে প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা যাবে?	● উৎসটি এমন হবে যাতে নির্ভর করা যায়। অর্থাৎ সহজে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়।	১। আমার কাছাকাছি থাকা তিন বন্ধু (বর্তমান সময়ের খাদ্যাভ্যাস জানার জন্য) ২। আমার দাদি ও প্রবীণ প্রতিবেশী (অতীতের খাদ্যাভ্যাস জানার জন্য)
৪। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি/বস্তু/ জায়গা ইত্যাদির কাছ থেকে কীভাবে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে?	● সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় বাছাই করা। এক্ষেত্রে প্রশ্নমালা তৈরি করলে তা হবে সহজবোধ্য এবং তা ৫/৬টি প্রশ্নে সীমাবদ্ধ হলে ভালো হয়। ● সেইসাথে বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। ● যদি পর্যবেক্ষণ করি তবে সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের ফলাফল ● লিখে রাখব বা রেকর্ড করব ।	সাক্ষাৎকারে বন্ধুদের জন্য প্রশ্নমালা ১। তুমি সাধারণত সকালে কী কী খেয়ে থাকো? ২। তুমি সাধারণত দুপুরে কী কী খাবার খেয়ে থাকো? ৩। তুমি বিকালে নাশতা হিসেবে কী খাবার খাও? ৪। তুমি রাতে কী কী খাবার খাও? সাক্ষাৎকারে প্রবীণ ব্যক্তির জন্য প্রশ্নমালা ১। ছোটোবেলায় আপনি সকালে কী কী খেতেন? ২। _____দুপুরে_____? ৩। _____বিকালে_____? ৪। _____রাতে_____?

পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর খুঁজি

সবার মতামতের ও পরামর্শের ভিত্তিতে নাসির ও আয়েশার বন্ধুদের মতো চলো আমরাও আমাদের দলগত পরিকল্পনাটি একটু ঠিক করে নেই। তারপর চলো পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে নেমে যাই।

কাজে নামার আগে একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যেনো উত্তরদাতার কাছ থেকে অনুমতি নিতে ভুলে না যাই। আমরা উত্তরদাতাকে নিচের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিব। যদি তিনি উত্তর দিতে রাজি হোন তবেই আমরা প্রশ্নগুলো করব।

একজন সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, আরেকজন নোট নিচ্ছে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

দলগত আলোচনা: গ্রামের ৫ জন গোল হয়ে বসেছে। সাথে ২ জন শিক্ষার্থীও আছে

পর্যবেক্ষণ

উত্তরদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া

১. কতক্ষণ সময় লাগতে পারে তা উত্তরদাতাকে জানাতে হবে।
২. কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা জানাতে হবে।
৩. উত্তরদাতাকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কোনো রকম চাপ দেওয়া হবে না তা জানাতে হবে।
৪. যেকোনো প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার জন্য তিনি স্বাধীন সেটা জানাতে হবে।
৫. উত্তরদাতার যেকোনো ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, বয়স ইত্যাদি) গোপন থাকবে তা জানাতে হবে।
৬. প্রাপ্ত তথ্য শুধুমাত্র এই কাজেই ব্যবহৃত হবে তা জানাতে হবে।

অনুসন্ধানী কাজের একটি উদাহরণ

নাসির তার বন্ধুদের প্রশ্ন করে বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ৪ বেলার যে সব খাবারের কথা জেনেছে সেগুলোর তালিকা তৈরি করল। তারপর একটি গোল কাগজকে ৪ ভাগে ভাগ করে একেক ভাগে প্রতি বেলার খাবারের তালিকা লিখল। একইভাবে প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া খাবারের তালিকাও সাজাল।

বর্তমানের খাদ্যাভাস

অতীতের খাদ্যাভাস

সিদ্ধান্ত

আমাদের দেশে গত ৩০ বছরে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে বড়ো পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে মানুষের খাবারে বৈচিত্র্য বেড়েছে। মানুষ এখন ফাস্ট ফুড এবং দেশি-বিদেশি আরও নানান ধরনের খাবার খেতে অভ্যস্ত হচ্ছে, যা আগে ছিল না। আগে মানুষ মূলত ঘরে তৈরি খাবার খেয়েই জীবন ধারণ করত।

এভাবে সাজানোর পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ফলাফল বোঝা কত সহজ হলো!

আয়েশা খুব সুন্দর করেই বিভিন্ন বেলার তালিকা ধরে খাবারের ছবি এঁকে, রং করে কেটে লাগিয়েছে।

চলো আমরাও নানা উপায়ে (যেমন- সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নমালা ইত্যাদি ব্যবহার করে) আমাদের অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। এভাবে আমরা যা জানতে পারলাম তা নানা উপায়ে (যেমন- শ্রেণি বিভাগ করে, শতকরা হিসাব করে, গড় মান বের করে) সাজাই যেন তা আমাদের অনুসন্ধানের ফলাফলকে বা একটি সিদ্ধান্তকে নির্দেশ করে।

অনুসন্ধানী কাজের দলগত উপস্থাপন

কত কাজই না করলাম আমরা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে। এবারে চলো আমরা যা যা করলাম ও যেসব ফলাফল পেলাম সেগুলো একসাথে উপস্থাপন করি যেন সকল বন্ধু বুঝতে পারে আমরা কী উপায়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি আর কীই বা পেলাম।

খেয়াল রাখি যেন নিচের বিষয়গুলো উপস্থাপনা থেকে বাদ না পড়ে। চাইলে তুমি প্রাসঙ্গিক অন্য কিছুও যোগ করতে পার তোমার উপস্থাপনায়

দলের নাম: ______________________________

সদস্যদের নাম:

১. ____________________ ২. ____________________

৩. ____________________ ৪. ____________________

১. অনুসন্ধানের প্রশ্ন:

২. প্রশ্নের মূল বিষয়বস্তু:

৩. যে উপায়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি: (ধাপগুলোর বর্ণনা)

৪. প্রশ্নের উত্তর/সিদ্ধান্ত:

৫. এ সংক্রান্ত যে সকল নতুন প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে:

উপস্থাপনটি আমরা নানা উপায়ে করতে পারি। দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে নাটক, দেয়াল পত্রিকা, প্রতিবেদন, সংবাদ পাঠ, কমিকস, ভিডিও, শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে এটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করি চলো।

১. আমি কী কী কাজ করেছি?

____

____

____

২. আমার এ কাজটি করতে কেমন লেগেছে?

৩. কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম কী? কীভাবে তার সমাধান করেছিলাম?

সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম	যেভাবে সমাধান করেছি/করার চেষ্টা করেছি	ভবিষ্যতে করণীয়

৪. (আরও কিছু প্রশ্ন তুমি নিজেও যোগ করতে পার, যা তোমার কাজটিকে বিশ্লেষণে সাহায্য করবে বলে তুমি মনে করো।)

তথ্য সংগ্রহের কিছু পদ্ধতি ও উপকরণ

ক) প্রশ্নমালা: সাধারণত কিছু প্রশ্ন লিখে বা টাইপ করে দেই যে কাগজে তাতেই লিখে সাক্ষাৎকারদাতা উত্তর দেন। এটিতে চাইলে প্রশ্নের উত্তরগুলো কয়েকটি বিকল্প হিসেবে দেওয়া যায়।

যেমন- আমার বিদ্যালয়ের অবস্থান:

☐ গ্রামে ☐ শহরে

খ) সাক্ষাৎকার: একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সামনাসামনি বা টেলিফোনে কিংবা অন্য মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত কিছু প্রশ্ন করা হয়। সেগুলো লিখে বা রেকর্ড করে সংরক্ষণ করা হয়।

গ) দলগত আলোচনা: কোনো একটি ইস্যু বা বিষয়বস্তু নিয়ে একদল সমগোত্রীয় (যেমন- একদল শিক্ষার্থী বা একদল শিক্ষক বা একদল পরিচ্ছন্নতা কর্মী) ব্যক্তিদের আলোচনা। আলোচনা থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে যা উঠে আসবে তাই হবে অনুসন্ধানের জন্য তথ্য।

ঘ) পর্যবেক্ষণ: এর মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মাথায় রেখে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, স্থান বা নিদর্শনকে খুব ভালোভাবে দেখি, যেমন– শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কী কী কাজ করে অথবা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কী কী ধরনের মাটি আছে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা যায়। পর্যবেক্ষণের তথ্য লিখে, মিলিয়ে, ছক করে, যাচাই করে, তালিকা (চেকলিস্টে) ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা যায়। একটি যাচাই তালিকার উদাহরণ:

শ্রেণিকক্ষের জিনিসপত্র	✓ (আছে) X (নেই)	মন্তব্য নেই
১। দরজা	✓	
২। জানালা	X	
৩। শিক্ষকের টেবিল	✓	
৪। শিক্ষকের চেয়ার	✓	
৫। বোর্ড	✓	
৬। গ্লোব	X	
৭। শিক্ষার্থীর টেবিল	✓	পর্যাপ্ত নয়
৮। শিক্ষার্থীর চেয়ার	✓	পর্যাপ্ত নয়
৯। দেয়ালে টাঙানো শিক্ষা পোস্টার	✓	শিক্ষকের তৈরি
১০। ক্যালেন্ডার	X	
১১। ময়লা ফেলার ঝুড়ি	X	

খুশি আপা:

আমরা যখন কোনো উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করি তখন সবসময় সরাসরি অনুসন্ধানের প্রশ্নটির উত্তর পাই না। এজন্য সংগৃহীত তথ্যগুলো সাজাতে হয়, কখনো কখনো কিছু হিসাব-নিকাশও করতে হয়। এভাবে তথ্যগুলো আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন এই গোছানো তথ্য দিয়ে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তে আসা যায়। তথ্য সাজানো গোছানোর এই প্রক্রিয়াকেই বলে

তথ্য বিশ্লেষণ

আমরা কি গবেষক?

চলো দেখি আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপগুলো অনুসরণ করে অনুসন্ধান চালিয়েছি কিনা:

আত্মমূল্যায়ন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার ধাপ	হ্যাঁ/না
১. অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি	
২. অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উপস্থাপন করেছি	
৩. প্রশ্ন থেকে মূল বিষয়গুলো খুঁজে বের করেছি	
৪. তথ্যের উৎস নির্বাচন করেছি	
৫. তথ্য সংগ্রহের উপকরণ নির্বাচন করেছি বা তৈরি করেছি	
৬. তথ্য সংগ্রহ করেছি	
৭. তথ্য বিশ্লেষণ করেছি	
৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি	

অনুসন্ধান চলবে........................

এতক্ষণ বন্ধুরা মিলে দলে অনুসন্ধান করেছি, এবারে একটু একা চেষ্টা করে দেখি। পারব কি একা করতে? চেষ্টা করেই দেখি না কি হয়! বন্ধুরা তো আছেই, আছেন খুশি আপাও। এবারে প্রত্যেকে আগের পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি চলো। আর আগের ছকগুলোর সাহায্যে নিজেরাই নিজের কাজকে বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করি।

আমরা কতটুকু শিখলাম?

আমাদের অনুসন্ধান কাজ চলাকালে আমরা নিজেরা যেমন নিজের কাজকে বিচার বিশ্লেষণ (স্বমূল্যায়ন/ আত্মমূল্যায়ন) করেছি, তেমনি আমাদের বন্ধুরা এবং খুশি আপাও (শিক্ষকের মূল্যায়ন) বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কেন করেছেন জানো? যেন আমরা এই অনুসন্ধান ভ্রমণে কোনো স্টেশনে থেমে না যাই। প্রতি স্টেশনে আমাদের এক একজনের সময় বেশি বা কম লাগতে পারে। কিন্তু সঠিক পথে যাচ্ছি তো? এজন্যই আমাদের কাজের বিশ্লেষণে আছে বন্ধুরা, আছেন খুশি আপা।

দলগত অনুসন্ধানের পুরো কাজটি শেষ হবার পর দলে বসে আলোচনা করে প্রত্যেক বন্ধুর জন্য অপর পৃষ্ঠার ছকটি পূরণ করি। এখানে শিখনের ৭টি ক্ষেত্র দেওয়া আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য তিনটি বিকল্প আছে। সবকটি ক্ষেত্রে ৩টি কাজের ধরনের মধ্যে যেকোনো একটি নির্ধারণ করে বন্ধুটির কাজের অংশগ্রহণের অবস্থা নির্দেশ করি। সঠিকটিতে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে বন্ধুটির শিখনের অবস্থা নির্দেশ করি।

সহপাঠীর মূল্যায়নের রুব্রিক্স:

নাম: ____

শিখনের ক্ষেত্র	কাজে অংশগ্রহণের ধরন		
	দক্ষ বা অগ্রসর	আংশিক বিকাশমান হয়েছে	আমাদের সাহায্য প্রয়োজন
১. প্রশ্ন উত্থাপন	আমাদের বন্ধুটি দলে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।	আমাদের বন্ধুটি দলে দুই/একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।	আমাদের বন্ধুটির অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন খুঁজে বের করতে বেশ সমস্যা হচ্ছে।
২. তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন তথ্য উৎস চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ তৈরি করা।	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুটি অংশগ্রহণ করেছে, মতামত দিয়েছে।	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুর ভবিষ্যতে আরও বেশি অংশগ্রহণ আশা করছি।
৩. তথ্য সংগ্রহ	আমাদের বন্ধুটি তথ্য সংগ্রহে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে।	বন্ধুটি তথ্য সংগ্রহে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও সাহায্য করেছে, যেমন– নোট নিতে, রেকর্ড করতে ইত্যাদি।	আমাদের বন্ধুটির তথ্য সংগ্রহে আরও সাহায্য আশা করি ভবিষ্যতে।
৪. তথ্য বিশ্লেষণ	বন্ধুটি সরাসরি তথ্য বিশ্লেষণ করেছে।	বন্ধুটি তথ্য বিশ্লেষণে সাহায্য করেছে, আইডিয়া দিয়েছে, পরিকল্পনা করেছে, কিছু হিসাব নিকাশে সাহায্য করেছে।	তথ্য বিশ্লেষণে ভবিষ্যতে বন্ধুটির আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ আশা করছি।
৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ	তথ্য সাজানো গোছানোর পর যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছে।	সাজানো তথ্য থেকে আংশিকভাবে সিদ্ধান্তে/ফলাফলে পৌঁছাতে পেরেছে, যুক্তি দাঁড় করাতে সাহায্য করেছে।	বন্ধুটির সিদ্ধান্ত/ফলাফলে পৌঁছানোর জন্য আরও সাহায্য প্রয়োজন।
৬. অনুসন্ধানী কাজে সার্বিক অংশগ্রহণ	আমাদের বন্ধুটি পুরো অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে।	বন্ধুটি কিছু কিছু ধাপে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে অথবা প্রতিটি ধাপেই অংশগ্রহণ করেছে তবে স্বতঃস্ফূর্ত নয়।	বন্ধুটিকে আমাদের আরও বেশি উৎসাহ দিয়ে দলের কাজে তার আগ্রহ তৈরি করতে হবে।

বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব

ইতিহাস মানুষের অতীত নিয়ে কথা বলে। অতীত শব্দটার মানে হচ্ছে, সেইসব ঘটনা যা এরই মধ্যে ঘটে গিয়েছে। এই যেমন আজ সকালে তোমরা স্কুলে আসার আগে যা যা কাজ করেছ তা সবই এখন অতীতের ঘটনা। কেননা কাজগুলো তোমরা করে ফেলেছ। একদিন আগের ঘটনা যেমন অতীত, এক হাজার বছর আগের ঘটনাও তেমনি অতীতের ঘটনা। আর এর সবই এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

চলো নিজের জীবনে অতীতে ঘটে গেছে এমন কয়েকটা মনে রাখার মতো ঘটনা নিচের ফাঁকা ঘরে লিখে ফেলি-

এক দিন আগের ঘটনা	
এক সপ্তাহ আগের ঘটনা	
এক বছর আগের ঘটনা	

তোমরা শিখেছ যে, ইতিহাস মানুষের অতীত কাজকর্মের যৌক্তিক বিবরণ। অতীতের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা ইতিহাস পাঠ থেকে জানা যায়। তোমার জীবনে অতীতে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনার মতোই বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী সকল মানুষের জীবনেও ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে নানান ঘটনা ঘটেছে। আজকের অধ্যায়ে তোমরা এই বাংলা অঞ্চলে মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানবে। এই অঞ্চলের মানুষের টিকে থাকার ইতিহাস জানবে। এই ইতিহাসের সাথে আরও যা জানবে তা হচ্ছে, বাংলা অঞ্চলের ভূগোল। ইতিহাস যেমন মানুষের অতীত কাজকর্মের বর্ণনা, তেমনি ভূগোল হচ্ছে সেই কাজকর্মের স্থান বা জায়গার বিবরণ। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, পৃথিবীর সকল স্থান একরকম নয়। এমনকি তোমরা নিজেরা যে গ্রামে বা মহল্লায় বসবাস করো সেখানেও রয়েছে ভূগোলের নানান বৈচিত্র্য।

ইতিহাস কি ভূগোলের উপর নির্ভরশীল?

আমাদের চারপাশে নানান রকমের ভূমি রয়েছে। কোথাও রয়েছে রাস্তা, কোথাও শস্যক্ষেত, কোথাও বন, কোথাও নদী, কোথাও পুকুর, কোথাও গভীর জঙ্গল। এই সবকিছুই হচ্ছে ভৌগোলিক উপাদান। ভৌগোলিক উপাদানকে প্রাকৃতিক উপাদানও বলা হয়। এইসব উপাদান মানুষের কাজকর্মকে নানানভাবে প্রভাবিত করে। ভূগোলের সাথে মানুষের সম্পর্ক খুবই গভীর। যেমন– নদী থেকে মানুষ মাছ ধরে। নদী থেকে পানি নিয়ে কৃষিকাজ করে। বন থেকে কাঠ ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। নদীর পানি থেকে আবার বন্যাও হয়। প্রকৃতিতে ঝড়-বৃষ্টি-সাইক্লোন হয়। সাধারণভাবে পৃথিবীব্যাপী মানুষসহ বনে-জঙ্গলে থাকা সাপ, বাঘ সহ আরো নানান প্রাণীর সহাবস্থান ছিল। মানুষ তার বাসস্থান, যাতায়াত ও চাষাবাদের প্রয়োজনে বনজঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন শুরু করে। এর ফলেই প্রকৃতির সাথে মানুষের যে সহবস্থানটি তা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

মানুষ আর ভূপ্রকৃতির সম্পর্কের ইতিহাস

ইতিহাস মানেই কেবল রাজা-বাদশাহদের যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা নয়। সুদূর অতীতে মানুষ যা কিছু দেখেছে, ব্যবহার করেছে তার সবই ছিল প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদান। খেয়াল করে দেখবে, একদিকে এই প্রকৃতিই ছিল মানুষের প্রধান আশ্রয়। মানুষ প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা ফলমূল ও পশু-পাখি শিকার করে জীবন ধারণ করেছে। প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা বাঁশ-বেত, কাঠ, পাথর, লতাপাতা দিয়ে বাসস্থান নির্মাণ করেছে। ঝড়-তুফান ও বন্য পশুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে।

পৃথিবীর বুকে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে অনেকগুলো অঞ্চল রয়েছে। আমাদের বাংলা তেমনই একটা অঞ্চল। ভৌগোলিকভাবে নির্ধারিত অঞ্চল যার রয়েছে পাহাড়, নদী আর ঘন জঙ্গল দিয়ে তৈরি প্রাকৃতিক সীমানা। আমরা মনে রাখবো, এই বাংলা অঞ্চল আর আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ কিন্তু এক নয়। বাংলা অঞ্চলেরই পূর্ব অংশে আমরা বাস করি। আমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করে এই ভূ-খড়ে কখন মানুষ বসতি স্থাপন শুরু করল?

বাংলা ভূখণ্ডকে আজ আমরা যেমনটা দেখছি, আদিকালে তা কিন্তু এমনটা ছিল না। এই ভূখণ্ডের তিনদিকের পাহাড় বেয়ে নেমে আসা পানি অসংখ্য নদ-নদী আর নানান জলাশয় সৃষ্টি করেছে। এর স্থলভাগের প্রায় পুরোটা জুড়েই ছিল ঘন বন আর জঙ্গল। মানুষের সংখ্যাও তখন খুব বেশি ছিল না। আজকের মতো ঘরবাড়ি ছিল না। বন্য পশু এবং প্রাকৃতিক নানান প্রতিকূলতার মধ্যে সেই সময় মানুষ জীবন ধারণ করত। ভূপ্রকৃতির এইসব উপাদানের সঙ্গে মিতালী করেই মানুষ টিকে থাকত। প্রাণ আর প্রকৃতির এমন বন্ধুত্ব ইতিহাসের শুরু থেকেই এই ভূখণ্ডে নানান রূপে কার্যকর রয়েছে। ভূপ্রকৃতির নানান প্রতিকূলতা জয় করে এই অঞ্চলের মানুষ যেভাবে বেঁচে থাকার কলা-কৌশল শিখেছে তা পৃথিবীর বহু অঞ্চলের মানুষের জন্য শিক্ষণীয়।

বাংলা অঞ্চল কোথায় এবং কেমন?

সাধারণভাবে অঞ্চল বলতে যে কোন একটি স্থানকে বুঝায়। কিন্তু ইতিহাস আর ভূগোলের আলোকে অঞ্চল শব্দটির রয়েছে পৃথক অর্থ। ভূগোলবিদগণ বলেন, অঞ্চল বলতে এমন একটি স্থানকে বুঝায় যার চারপাশে প্রাকৃতিক সীমানা রয়েছে, রয়েছে ভূপ্রকৃতির নানান উপাদান। আর ঐ সীমানার ভেতরে এমন একদল মানুষ বসবাস করেন, যাদের ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য থাকলেও অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। আমরা অবশ্যই মনে রাখবো, একটা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য, পার্থক্য, নানান মত আর চিন্তার মানুষ থাকবে। সবাই মিলে-মিশে বসবাস করাই মানুষের সৌন্দর্য।

যাহোক, বাংলাকে একটি অঞ্চল বলা যায় কেননা এর চারপাশে প্রাকৃতিক সীমানা রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব অংশে বাংলা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর উত্তরে রয়েছে হিমালয় পর্বত, পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি, পশ্চিমে রাজমহল, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্যময় ভূমি, ছোটনাগপুরের পর্বতসমূহের উঁচুভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দেখে যেন মনে হয় একটা অঞ্চলকে চারপাশ থেকে পাহাড়, জঙ্গল ও সমুদ্র ঘেরাও করে রেখেছে। এই সীমানার ভেতরেই রয়েছে বাংলা নামের ভূখণ্ড, বাংলা অঞ্চল। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব অংশ।

অঞ্চল মূলত ভৌগোলিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা ভূপ্রাকৃতিক সীমানা দিয়ে চিহ্নিত কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। এর সৃষ্টির পেছনে মানুষের কোনো হাত থাকে না। ভূপ্রকৃতিই অঞ্চলটিকে গড়ে তোলে। ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে ভৌগোলিকভাবে বাংলা হচ্ছে এমনই একটি অঞ্চল। আবার রাজনৈতিকভাবেও বাংলা নামের একটি রাজ্য বা প্রদেশের কথা আমরা জানতে পারব। সেই বাংলা রাজ্য/ প্রদেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে বিভিন্ন সময়ে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ শাসনকারী শাসকেরা। ইতিহাসের নানান পর্যায়ে নানান শাসকের দ্বারা সীমানা বেড়েছে, আবার কখনও কখনও কমেছে। অর্থাৎ নানান সময়ে নানানভাবে সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। আমাদের তাই মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন শাসনকালে নির্ধারিত 'বাংলা' রাজ্য আর প্রাকৃতিকভাবে তৈরি 'বাংলা অঞ্চল' এক নয়।

মানচিত্র: আঞ্চলিক বাংলা ও বাংলাদেশ (১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

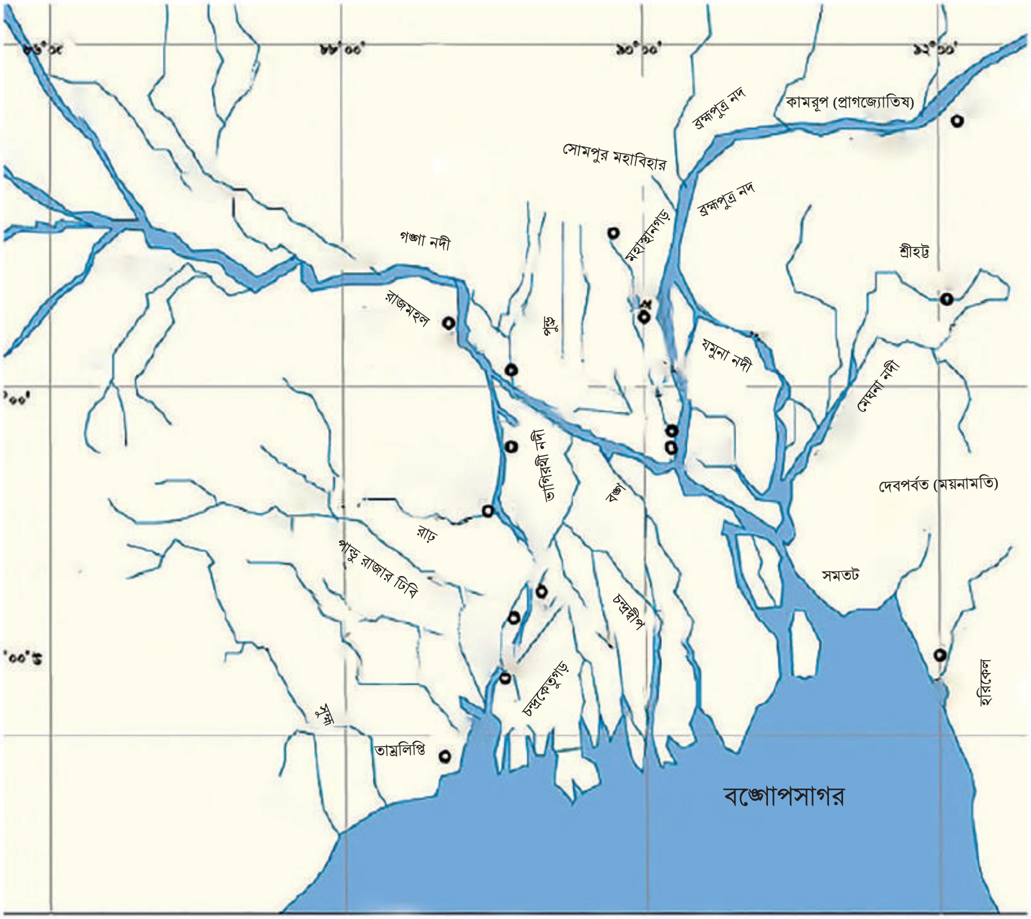

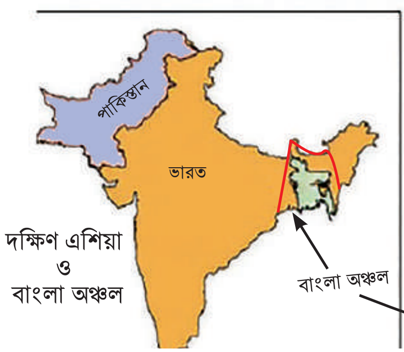

নদ-নদী

বাংলা অঞ্চল

লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত অংশটি প্রাকৃতিক সীমানা বেষ্টিত বাংলা অঞ্চলের আনুমানিক সীমানা।

মানচিত্র: আঞ্চলিক বাংলা ও বাংলাদেশ (১৩০০-১৮০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

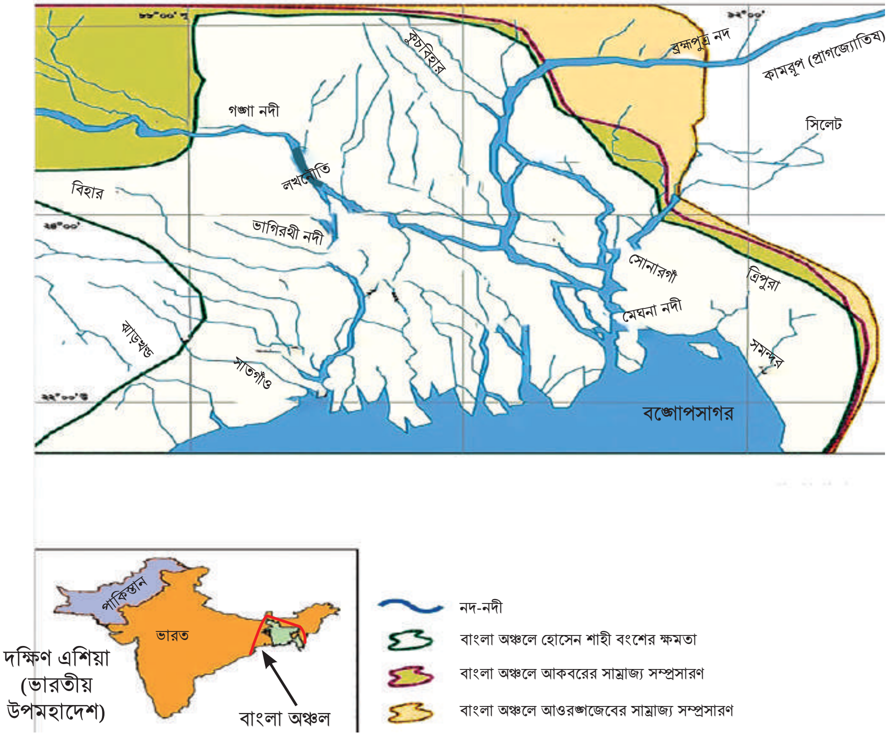

ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশ (বাংলা অঞ্চলের বড়ো একটা অংশ নিয়ে ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশ গঠিত হয়েছিল)

> ভারতবর্ষের পূর্ব অংশে অবস্থিত প্রাকৃতিক সীমানাবেষ্টিত ভূ-খন্ডটি বাংলা অঞ্চল নামে পরিচিত। বাংলার রাজনৈতিক সীমানা নানান সময়ে নানান রূপে পরিবর্তিত, সংযোজিত এবং সংকুচিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানকালে ভারত ভাগের মতোই বাংলা অঞ্চলকেও বিভক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

উপরের মানচিত্রগুলো ভালোভাবে খেয়াল করে দেখি। একটিতে আছে বর্তমান বাংলাদেশ, অন্যটিতে আছে বাংলা অঞ্চল। ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা অন্তত দুই হাজার বছর আগে থেকে ইতিহাস অনুসন্ধান শুরু করি, তাহলে দেখব কেবলই একটা ভূখণ্ড। সেই সময়ে এই ভূ-খন্ডে বাংলাদেশ বলে কোনো দেশ ছিল না, বাংলা নামটিও ছিল না। ভূপ্রাকৃতিক সীমানা দিয়ে চিহ্নিত এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের কয়েক হাজার বছরের নানান ঘটনার ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

তাহলে দুই হাজার বছর আগে এই অঞ্চলের ইতিহাস কেমন ছিল? বাংলা নামের যে অঞ্চলটি ম্যাপে দেখতে পাচ্ছ, এই অঞ্চলে তখন বঙ্গ, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সমতট, হরিকেল নামে ছিল প্রাচীনকালের কতগুলো ছোট ছোটো ইউনিট বা রাজ্য। এগুলোকে জনপদ বলা হয়। নানান সময়ে এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান বৈশিষ্ট্যের মানুষের আগমন ঘটেছে।

মুগল শাসক আকবর উত্তর ভারত থেকে সৈন্য পাঠিয়ে বাংলা অঞ্চলের একটি অংশে তার আধিপত্য বিস্তার করেন। বাংলা ছিল তাঁর শাসিত একটি প্রদেশ। সেই সময় এর নাম ছিল সুবা বাংলা। আকবরের অধীনে থাকা এলাকার নাম 'সুবা বাংলা' হলেও বাংলা অঞ্চলের পুরোটা কিন্তু সম্রাট আকবর তার শাসনের অধীনে আনতে পারেননি। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হবার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে বাংলা অঞ্চল নিয়ে এমন ঘটনাই বারবার ঘটেছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ বাঙ্গালা, বেঙ্গালা, বেঙ্গাল, ইস্ট বেঙ্গাল, ওয়েস্ট বেঙ্গাল ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। উপরের মানচিত্র অনুসন্ধান থেকে আশা করি বাংলা অঞ্চল এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস এবং এর সীমানার হ্রাস-বৃদ্ধি কতোটুকু হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারব।

আমরা যখন নবম ও দশম শ্রেণির ইতিহাসে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে শাসনকারী রাজাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করবো তখন গুপ্ত, দেব, চন্দ্র, পাল, সেন, খলজি, হোসেন শাহী, তুর্কী-আফগান ও মুগল প্রভৃতি রাজবংশের রাজাদের ইতিহাস জানতে পারব।

বাংলা অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি কেমন?

বাংলা অঞ্চলের সীমানা সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়েছি। এবার চলো, বাংলা অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক উপাদানগুলো সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

বাংলা অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক উপাদানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় নদ-নদীর কথা। বাংলা পৃথিবীর অন্যতম নদীবহুল অঞ্চল। এ অঞ্চলে মানুষের বিচরণ এবং টিকে থাকার ইতিহাসের সাথে নদ-নদীর রয়েছে তাই গভীর সম্পর্ক। পৃথিবীর প্রাচীন প্রায় সকল সভ্যতারই জন্ম হয়েছে কোনো-না-কোনো নদীকে কেন্দ্র করে। বাংলা অঞ্চলেও প্রাচীন যেসব জনবসতির চিহ্ন পন্ডিতগণ খুঁজে পেয়েছেন তার সবই কোনো-না-কোনো নদীকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, করতোয়া, সুরমা, মেঘনা, কর্ণফুলী এখনও বাংলা অঞ্চলের প্রধান প্রধান নদ-নদী হিসেবে পরিচিত। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে অসংখ্য শাখানদী এবং উপনদী।

হিমালয় পর্বতের বরফ গলা বিপুল পরিমাণ পানি বিভিন্ন নদীর মাধ্যমে দক্ষিণে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। যাবার সময় নদীগুলো বিলীন করে দেয় তীরবর্তী অসংখ্য গ্রাম-ঘর-জনপদ। আবার এই নদী তীরের উর্বর জমিতে চাষাবাদ করেই মানুষ জীবন ধারণের পথ খুঁজে নেয়। নদীর সাথে মানুষের জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক তাই খুবই প্রাচীন।

বাংলায় আদিকালে মানুষের বিচরণের যেসব প্রমাণাদি রয়েছে সেগুলো প্রায় সবই নদী তীরবর্তী উঁচুভূমি বা পার্বত্য এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। আদিকালে নিচু এলাকাগুলোতে ছিল গভীর বন আর জঙ্গল। বর্ষায় প্লাবিত হয়ে যেতো অনেক এলাকা। মানুষ শুরুর দিকে তাই উঁচু এলাকাগুলোতেই বসতি স্থাপন করেছে। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিচু ও নদী তীরবর্তী অরণ্য এলাকায় এই বসতির বিস্তার হয়েছে।

বন কেটে বাসস্থান নির্মাণ আর চাষের জমি তৈরির কথা কিন্তু রূপকথার মতো মনগড়া কাহিনি নয়। একদম সত্য কথা। বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে শাসকেরা ইতিহাসের প্রায় সকল যুগেই সবচেয়ে বেশি রাজস্ব বা কর পেতেন কৃষি থেকে। এইজন্যে তারা চাইতেন চাষের জমি বৃদ্ধি করতে। জঙ্গল কেটে চাষের জমি বের

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

করার জন্যে রাজাগণ পানি-কাদাময় জঙ্গাল এলাকায় রাজস্ব-মুক্ত জমি দান করতেন। এখনও মানুষ অনেক জায়গাতেই দেখবে নদী ভরাট করে হাট-বাজার এবং বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে তুলে। শহরের খালগুলি দখল করে বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা বানায়। এইগুলা একদমই উচিত কাজ নয়। নদী ও খাল ভরাটের ফলে দেশে বন্যা হয়। জলের অভাবে ফসল বিনষ্ট হয়। শহরে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। মানুষের ভোগান্তি বাড়ে।

বন-জঙ্গাল কেটে চাষের জমি বৃদ্ধি করার চিত্র। এইভাবে বন-জঙ্গালের ক্ষতি করা হয়েছে গত কয়েক হাজার বছর ধরে। এভাবে জলাশয় বা পানির বিভিন্ন উৎস যেমন পুকুর, খাল, বিল, ঝিল, হাওর, বাওর ইত্যাদি ভরাট করেও প্রকৃতির ক্ষতি করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবে, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষা করা মানুষ হিসেবে আমাদের সকলের প্রথম ও প্রধান কাজ। তা না হলে আমরা বেঁচে থাকতে পারব না।

বাংলার আবহাওয়া এবং জলবায়ুও এখানকার মানুষের জীবনে নানান সুবিধা ও অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে ঝড়, বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস হয়। অতিমাত্রায় বৃষ্টি হলে এখানকার অধিকাংশ ফসলের জমি আর ঘরবাড়িতে পানি উঠে যায়। প্লাবিত হয়। বন্যার পর পলি জমা হয়ে উর্বর হয় চাষক্ষেত্র। বৃষ্টির পানি সেচের সুবিধা এনে দেয় শস্যক্ষেত্রে। প্রকৃতির প্রতিটা উপাদান এভাবেই কালের বিবর্তনে বাংলা অঞ্চলের মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা এবং অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। বেঁচে থাকার উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ এবং খাদ্য উৎপাদনের সুবিধা যেমন দিয়েছে, তেমন দিয়েছে ঝড়-বৃষ্টি, সাইক্লোনের কারণে খাদ্য সংগ্রহ এবং উৎপাদনের কাজে নানান অসুবিধা। হাজার বছর ধরে প্রকৃতির সাথে বোঝাপড়া করে তবেই টিকে থাকতে হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষকে।

বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব

'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' বলে একটা প্রবাদ আছে। শুনেছো কেউ তোমরা? এই প্রবাদ সেই আদিকাল থেকেই বাংলা ভূখণ্ডের মানুষের জীবনে সত্য হয়ে আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এই ভূখণ্ডে মানুষের আগমন ঘটেছে। মানুষ বসতি স্থাপন করেছে। এর প্রধান কারণ বাংলা অঞ্চলের অফুরাণ খাদ্য ভাণ্ডার। বনে পশু, ফলমূল এবং নদীগুলোতে উপচে পড়া মাছ – মানুষকে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকার জন্য খাবার সরবরাহ করেছে। শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। আর এভাবেই বাংলা অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির সঙ্গে বাংলার মানুষের বোঝাপড়ার এক সম্পর্ক রচিত হয়েছে।

আজ থেকে কত বছর আগে বাংলা অঞ্চলে প্রথম মানুষ আসে? কীভাবে সেই মানুষের কথা আমরা জানতে পারি? বাংলা অঞ্চলের উত্তরাংশ, পূর্বাংশ এবং পশ্চিমাংশের কিছু পাহাড়ি এলাকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। খেয়াল করলে দেখা যায়, বাংলা অঞ্চলের যেসব স্থানে এসব হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে সেই স্থানগুলো আশেপাশের এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং কোনো একটা নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানগুলো বর্তমানে বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বিভিন্ন অংশে খুঁজে পাওয়া যাবে।

পান্ডু রাজার ঢিবি: তামা আর পাথর ব্যবহারের সভ্যতা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ পার হয়ে বাংলার মানুষেরা ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করেছে। এই দুই যুগের মধ্যেখানে তামা আর পাথর ব্যবহার করে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল একদল মানুষ। তাম্র-প্রস্তর যুগের এই সভ্যতার নাম পান্ডুরাজার ঢিবি। বাংলা অঞ্চলে এটাই প্রাচীন মানব বসতির আদি নিদর্শন। সংগঠিতভাবে কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি ও সমাজ রচনার প্রথম প্রমাণ। অঞ্চলটির পশ্চিম অংশে অজয় নদের তীরে আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই সভ্যতার মানুষেরাই পাথরের পাশাপাশি ধীরে ধীরে তামা এবং আরো পরে লোহার ব্যবহারের সাথে পরিচিত হয়েছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যভিত্তিক অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন ব্যবস্থা তাদের হাতেই প্রতিষ্ঠা পায়। পাণ্ডু রাজার ঢিবি প্রত্নস্থলটি খুঁজে পাওয়া যাবে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলায়। এই অধ্যায়ের মানচিত্রে পাণ্ডু রাজার ঢিবি প্রত্নস্থলের অবস্থান চিহ্নিত করা আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাচীন মানুষের ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রীর অসংখ্য নমুনা পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলক, আগুনে পোড়ানো হাতে তৈরি মৃৎপাত্র, তাম্রনির্মিত গুটিকা, আংটি, বঁড়শি, সুর্মার শলাকা তীরের ফলা, হাড়ের তৈরি সূঁচ, হারপুণ লোহার হাতিয়ার, থালা ইত্যাদি। খননের সময়েই পান্ডুরাজার ঢিবিতে এক রকমের কালো পাথরের গোলাকার একটা সিল পাওয়া গিয়েছে। সিলের গায়ে প্রাচীন বর্ণমালার মতো কিছু চিহ্ন রয়েছে। এই বিশেষ ধরনের পাথর এবং লেখার সঙ্গে ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত পাথর আর লেখার মিল পাওয়া যায়। এই মিলের ইঙ্গিত ধরে ইতিহাসবিদগণ অনুমান করে থাকেন যে, আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর আগে ভূ-মধ্যসাগর এলাকার ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে বাংলা অঞ্চলের মানুষের বাণিজ্য যোগাযোগ ছিল। বাণিজ্যের সূত্র ধরে অঞ্চল দুটির মধ্যে খুব সম্ভবত সাংস্কৃতিক যোগাযোগও গড়ে উঠেছিল।

মহাস্থানগড়: বাংলার প্রথম নগর সভ্যতা

পান্ডুরাজার ঢিবি নিয়ে জানার পর এইবার চলো, বাংলা অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সর্ববৃহৎ নগর-বসতি সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক। নগর-বসতিটির নাম হচ্ছে, মহাস্থানগড়। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে বাংলা অঞ্চলের উত্তরাংশে নগর সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এটিকে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের বগুড়া জেলায়, করতোয়া নদীর তীরে। সময়ের সাথে সাথে সেই বসতির মানুষেরা নানান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষিভিত্তিক গ্রাম থেকে সুরক্ষিত দুর্গ নগরী গড়ে তুলেছিল। এই পাঠের মানচিত্রে মহাস্থানগড় প্রত্নস্থলের অবস্থান চিহ্নিত করা আছে।

মহাস্থানগড়ের সমগ্র প্রত্নস্থলটি কালক্রমে মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। নিয়মতান্ত্রিক খননের মাধ্যমে পুনরায় এটি আবিষ্কার করা হয়েছে। মহাস্থানে পাওয়া গিয়েছে মাটির মেঝে সহ মাটির ঘর, বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র, চুলা, থালা, গামলা, মাটির দেয়াল, ইটের তৈরি রাস্তা, পোড়ামাটির পাতকূয়া, রূপার বালা ও মুদ্রা, ইটের

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

টুকরা, ব্রোঞ্জের আয়না ও প্রদীপ, ছাঁচে ঢালা মুদ্রা এবং পোড়ামাটির চিত্রফলক সহ নানান নিদর্শনাবলী।

মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত ইটের তৈরি রাস্তা। বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের প্রত্নতত্ত্ববিদগণের একটি দল এগুলো খুঁড়ে বের করেছেন

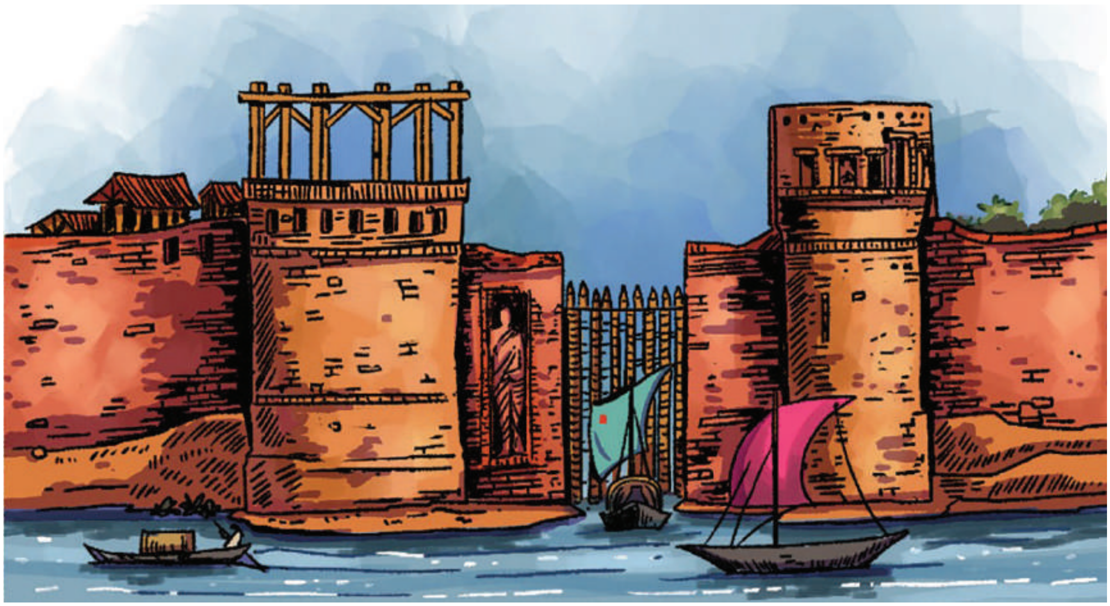

মহাস্থানগড় ও করতোয়া নদীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ছিল। পুণ্ড্রনগর গড়ে উঠেছিল করতোয়া নদীকে কেন্দ্র করে। নদীটি ছাড়া এই নগরকেন্দ্র বিকশিত হতো না। টিকে থাকতে পারত না। তোমরা এই নগরকেন্দ্রর সঙ্গে করতোয়া নদীর সম্পর্ক কেন এতো ঘনিষ্ঠ ছিল বলতে পারবে? এখনো বাংলাদেশে বেশিরভাগ শহর-গঞ্জ-হাট নদীর তীরে অবস্থিত। নদীগুলোর অনেকগুলোই আর আগের মতো পানি বহন করে না। অথবা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু পুরানো হাট-বাজার-গঞ্জ-শহর এখনো নদীর তীরেই রয়েছে। নদী যখন তার প্রবাহপথ পাল্টেছে বা এক খাত থেকে অন্য খাতে সরে গেছে বসতিগুলোও স্থানান্তরিত হয়েছে। এখন রাস্তার মাধ্যমে হয়ত যোগাযোগ ও পরিবহন সহজ হয়েছে। কিন্তু আগে যখন নদীগুলোতে সারাবছর পানি থাকত তখন নদীগুলোই ছিল চাষাবাদ, যোগাযোগ, বাণিজ্যের প্রধান পথ। অনেকটা আমাদের শরীরের রক্তনালীর মধ্যের রক্তপ্রবাহ যেমন আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, নদী ও তার মধ্যের বৃষ্টির পানিপ্রবাহ বাংলাদেশের মানুষ, জমি ও যোগাযোগকে হাজার হাজার বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। নদীকেন্দ্রিকতা আর নদীর উপরে নির্ভরশীলতা ছাড়া বাংলা অঞ্চলে মানুষের বসতি গড়ে ওঠা আগেও সম্ভব ছিল না। এখনও কঠিন। [ছবিটি কল্পনা করে আঁকা। সূত্র: সাজিদ বিন দোজার চিত্রের রূপান্তরিত রূপ]

মহাস্থানের নগরের বাইরের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও বসতি কেমন ছিল? [সূত্র: সাজিদ বিন দোজার কল্পিত চিত্রের রূপান্তর]

বাংলার প্রথম শিলালিপি আর সবচাইতে পুরানো নগর

ইতিহাসের আদিকালে রাজারা তাদের শাসন, আইন ও দানের কথা বিভিন্ন শিলাখন্ড এবং তামার পাতে লিখে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করতেন। মহাস্থানে প্রাপ্ত লিপিটি এমনই একটি রাজকীয় দলিল। বাংলা অঞ্চলে এমন অনেক লিপি পাওয়া গিয়েছে। আর এখন পর্যন্ত পাওয়া এইসব লিপির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপিটি হচ্ছে মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি। লিপিটি লেখা হয়েছে ৩০০ সাধারণ পূর্বাব্দে মৌর্য শাসনকালে। যে লিপিতে লেখা হয়েছে তা হচ্ছে ব্রাহ্মী লিপি। একটি গোল পাথরের উপর মাত্র ৭ লাইনে লিখিত শিলালিপিটিতে সর্বপ্রথম 'নগর' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে নিশ্চিত করে জানা যায় যে, মহাস্থানগড় প্রত্নস্থলের আশেপাশেই 'পুন্ড্রনগর' নামে বাংলা অঞ্চলের প্রথম নগর এবং রাজধানী গড়ে উঠেছিল।

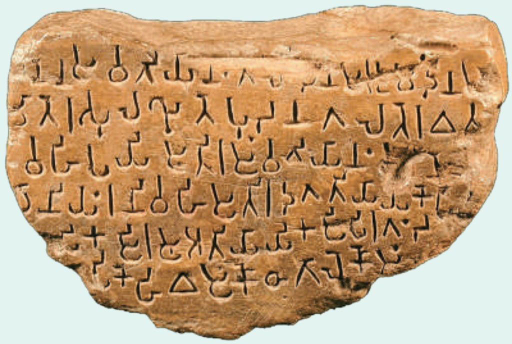

মহাস্থানগড় ব্রাহ্মীলিপি (৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ বা সাধারণ পূর্বাব্দ)

লিপিটি জারি করা হয়েছিল প্রাচীন মৌর্য সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে পুন্ড্রনগরে কর্মরত প্রাদেশিক শাসকের উদ্দেশে। লিপিতে বলা হয়েছে, তেল, ডুম, ধান এবং মুদ্রা দিয়ে যেন পুন্ড্রনগরের কোষাগার পূর্ণ করে রাখা হয়, যাতে কোন ধরনের দুর্যোগ, অগ্নিকান্ড, বন্যার কারণে শস্য নষ্ট হলে এই ধনভাণ্ডার থেকে মানুষকে সাহায্য করা যায়।

-ইতিহাসবিদ ড. এনামুল হক, বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র

মহাস্থানগড়ের সমস্ত নগরীটি ছিল ইটের তৈরি দেয়াল ও পরিখা দিয়ে বেষ্টিত দুর্গের মতো। এর চারদিকে চারটি প্রবেশদ্বার, প্রতিরক্ষা চৌকি ও ভেতরে পাকা রাস্তা ছিল। জলনিষ্কাশনের জন্য ছিল পৃথক ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে দেখা যায় যে, এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ নগরের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। ধারণা করা হয়, প্রায় দেড় হাজার বছর অস্তিত্ব রক্ষার পর কোনো যোদ্ধা রাজা বা গোষ্ঠীর আক্রমণ অথবা ভূমিকম্পের কারণে নগরীটি হয়ত বসবাসের উপযোগিতা হারিয়ে কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার দুটো বন্দর

বাংলা অঞ্চলের সবচাইতে প্রাচীন বন্দরের নাম হচ্ছে তাম্রলিপ্তি। বাংলার এই বন্দর প্রাচীনকালে ৮ম শতক পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। বস্ত্রশিল্প সহ আরো নানান দ্রব্য-সামগ্রীর বাণিজ্য চলেছে এই বন্দরের মাধ্যমে। বন্দরটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তমলুক জেলায়। সমন্দর নামে আরেকটি বিখ্যাত বন্দর গড়ে উঠেছিল বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে। বন্দরটি পাওয়া যাবে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায়। বাংলা অঞ্চলের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এই বন্দরের মাধ্যমে। ৯ম শতকের পর থেকে বন্দরটি চালু হয়। এমন আরো অনেকগুলো বন্দর গড়ে উঠেছিল বাংলার নদী এবং সমুদ্রপথে সহজ যোগাযোগের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করে। নদীর পাশাপাশি আরও কিছু ভৌগোলিক উপাদান এইসব নগর প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই অধ্যায়ের মানচিত্রে তাম্রলিপ্তি এবং সমন্দর বন্দর নগরের অবস্থান চিহ্নিত করা আছে।

১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার ভূপ্রকৃতি কীভাবে ভূমিকা পালন করেছিল তা জেনে নেওয়া যাক। পূর্ব বাংলা বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশমতো 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা' করছিলেন। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্রের দিক থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর মতো শক্তিশালী ছিলেন না। কিন্তু যুদ্ধ-কৌশলে তাঁরা এগিয়ে ছিলেন। জল-জঙ্গল বেষ্টিত ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশেই বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা জন্মগ্রহণ করেছেন। বড়ো হয়েছেন। বাংলার জল-জঙ্গলে বেঁচে থাকার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। পানিতে ডুব দিয়ে, বৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে, ঘন বন-জঙ্গলের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করেন মুক্তিযোদ্ধারা। অপরদিকে পাকিস্তানের ভৌগোলিক পরিবেশ ছিল বাংলা অঞ্চলের বিপরীত। এর ফলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী খুব সহজেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পরাজিত হয়।

মানুষ ও প্রকৃতির এই সম্পর্ক একেকটি ভূখন্ডে একেকভাবে তৈরি হয়। বাংলা অঞ্চলে প্রাণ-প্রকৃতির বোঝাপড়ার অভিজ্ঞতা একরকম। ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বোঝাপড়া বহুক্ষেত্রেই আলাদা। পৃথিবীতে মানুষের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি অঞ্চলভেদে পৃথক হয়ে থাকে। মানুষের বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতাও তাই ভূ-পৃষ্ঠের ভিন্নতা অনুযায়ী পৃথক। ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় ভিন্ন ভিন্ন ভূ-খন্ডে নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মানুষের এই টিকে থাকার ইতিহাসই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস।

পৃথিবীতে ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্য মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ধারাকেও করেছে বৈচিত্র্যময়। ইতিহাসে সংঘটিত ঘটনাগুলো স্থানভেদে তাই নানান রকমের হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতার কারণেই মূলত প্রতিনিয়ত এই পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটে।

আমাদের চারপাশের ভৌগোলিক পরিবেশ

আমরা এতক্ষণ বাংলা অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক পরিবেশ সম্পর্কে জানলাম। চলো আমরা আমাদের চারপাশের ভৌগলিক পরিবেশ কেমন তা নিয়ে একটু চিন্তা করি। আমরা কাজটি দলগতভাবে করবো। এজন্য আমরা ৫-৬ জনের একটি করে দল গঠন করি। দলে আলোচনা করে নিচের তিনটি থিমের উপর আমরা প্রশ্ন তৈরি করব।

১. ভৌগলিক পরিবেশের উপাদান

২. আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব

৩. আমাদের এলাকার মানুষের পেশার সাথে ভৌগলিক পরিবেশের সম্পৃক্ততা

লক্ষ রাখব কাজটি করার জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপ অনুসরণ করবো। প্রয়োজনে আমরা 'বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি' অধ্যায়টি আরেকবার পড়ে নিতে পারি।

আরেকটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবো এই তথ্য সংগ্রহের আগে আমরা উত্তরদাতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিব। অনুমতি নেওয়ার সময় কি কি বিষয় উত্তরদাতাকে জানাতে হবে তা নিশ্চয় আমাদের মনে আছে। প্রয়োজনে আমরা দলে আলোচনা করে নিতে পারি যেনো সবাই এটি মেনে চলতে পারি।

দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব

বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা অনেকগুলো নতুন বিষয় জেনেছি, শিখেছি। বাংলা কেন একটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল তা যেমন জেনেছি, তেমনই শিখেছি এই ভূপ্রকৃতি মানুষের ইতিহাসে কতোভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এটাও অনুধাবন করতে পেরেছি যে, পৃথিবীর সকল স্থানের ভূপ্রকৃতি এক রকম নয়।

পৃথিবীতে রয়েছে শস্য-শ্যামল প্রান্তর, উঁচু উঁচু পর্বত, মালভূমি, ধু ধু মরুভূমি, দুর্গম বন-জঙ্গল। আরও রয়েছে ধবধবে সাদা তুষার আবৃত মেরু অঞ্চল এবং সাগর ও মহাসাগর। একেকটি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি একেক রকম। অঞ্চল ভেদে মানুষের কাজকর্মও তাই ভিন্ন হয়ে থাকে। মানুষের সকল কাজকর্মের সাথে প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর রয়েছে গভীর সম্পর্ক। ভূগোলের সাথে মানুষের এই সম্পর্ক আমরা ‘বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব’ অধ্যায়ে পড়েছি। এইবার চলো, দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব কী রকম তা জানার চেষ্টা করি।

অনুসন্ধানী কাজ

পৃথিবীর ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো বৈচিত্র্যময়। নদী, পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, জঙ্গল, মালভূমি- এই সবই হচ্ছে ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। চলো, এইরকম আরও কিছু ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের নাম খাতায় লিখে ফেলি। কোন ধরনের পরিবেশে মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করে তা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করার চেষ্টা করি:

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকার ইতিহাস জানার জন্য পন্ডিতগণ বছরের পর বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আদি মানুষের শরীরের কঙ্কাল ও হাড়গোড় খুঁজে পেয়েছেন। মানুষের শরীরের এই হাড়গোড়কে বলা হয় জীবাশ্ম বা ফসিল। এগুলো নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা হলেন জীবাশ্মবিজ্ঞানী। জীবাশ্মবিজ্ঞানীদের সঙ্গে ইতিহাসবিদসহ আরও নানান পেশার পন্ডিতগণ যুক্ত হন। এইসব উপাদান নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেন। গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এইভাবে লক্ষ লক্ষ বছর আগের মানুষের কঙ্কাল ও হাড় বিশ্লেষণ করে তাঁরা মানুষের ইতিহাস জানার চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন সময়ে মানুষের কঙ্কাল বা হাড়গোড় মাটির নিচ থেকে গবেষকগণ উদ্ধার করেন। এসব হাড় হাজার হাজার বছর ধরে শক্ত হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় অনেক আর্দ্র জলবায়ুতে হাড় ক্ষয় পেতে পেতে বিলুপ্তও হয়ে যায়। পরিবেশের উপরে হাড় টিকে থাকবে কি না তা নির্ভর করে। এই ধরনের হাড় বা শরীরের টিকে থাকা অবশেষকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলা হয়

মানুষের জীবাশ্মের পাশাপাশি তাদের ব্যবহৃত অনেক হাতিয়ারও পাওয়া যায় পৃথিবীর অনেক স্থানে। হাতিয়ারগুলো থেকেও আদি মানুষের জীবন-যাপন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। প্রায় ৩৩ লক্ষ বছর আগে সর্বপ্রথম পাথরের হাতিয়ার তৈরি করে মানুষ ছোটো ছোটো কাজ করা শেখে। তারা একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকত, গুহায় বসবাস করত, শিকার করতে বা ফলমূল সংগ্রহ করতে পারত। আমরা জানি যে, এই যুগকে বলা হয় পাথরের যুগ। পাথরের যুগে মানুষ শিকার, সংগ্রহ এবং নিজের আত্মরক্ষার জন্যে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। পাথরের যুগের তিনটি পর্যায় রয়েছে যা আমরা ইতিহাস জানার উপায় অধ্যায়ে জেনেছি।

নতুন পাথরের যুগের শেষ পর্বে তামা আবিষ্কৃত হয়। পাথর থেকে তামার আকর নিয়ে তা উত্তপ্ত করে কাঁচা তামা বের করে আনা হতো। সেই তামা দিয়ে হাতিয়ার নির্মাণের কাজ চলত। পাথরের পাশাপাশি তামার ব্যবহার শুরু হয় বলে এই সময়টাকে বলা হয় তাম্র-প্রস্তর যুগ।

আদি যুগে মানুষ পাথর থেকে তামার আকর বের করে নিয়ে আসতো। সেই আকর আগুনে গলিয়ে তৈরি করা হতো নানান রকম হাতিয়ার

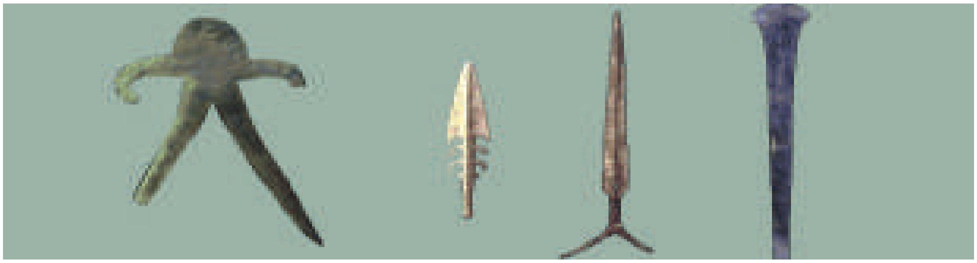

ভারত উপমহাদেশের উত্তরাংশে প্রাপ্ত তাম্রপ্রস্তর যুগের কয়েকটি হাতিয়ার ও নিদর্শন

যেমনটা আমরা আগেই জেনেছি, নতুন পাথরের যুগে মানুষ প্রথম কৃষির আবিষ্কার করে। এই ঘটনাটিকে ইতিহাসে 'কৃষি বিপ্লব' বলা হয়। ভারত উপমহাদেশে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় এই বিপ্লব শুরু হয় আজ থেকে আনুমানিক কম-বেশি ৯ হাজার বছর পূর্বে। বাংলা অঞ্চলে খুব সম্ভবত শুরু হয়েছিল আনুমানিক ৭ হাজার বছর পূর্বে। কৃষি আবিষ্কারের আগে মানুষকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো খাদ্যের খোঁজে। কৃষি কাজ শিখে ফেলার পর মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের পশুপালন করাও রপ্ত করে। গ্রাম ও শহরের মতো বসতি গড়ে ওঠে নানান স্থানে।

কৃষিবিপ্লব: মানবসভ্যতার প্রথম বিপ্লব

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ড প্রথম এই বিপ্লবের নাম দিয়েছেন 'নবোপলীয় বিপ্লব' বা 'কৃষি বিপ্লব'। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ ও শিকারের জীবন ত্যাগ করে খাদ্য উৎপাদনের জীবনে প্রবেশ করে। এই বিপ্লবের ফলে মানুষ যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলার সুবিধা লাভ করে।

নগরবিপ্লব: মানবসভ্যতার দ্বিতীয় বিপ্লব

মানব সভ্যতার দ্বিতীয় বিপ্লবকে বলা হয় 'নগর বিপ্লব'। নগর বিপ্লব কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ড। তিনি তাঁর Man Makes Himself গ্রন্থে নগর বিপ্লবের দশটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে- লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং শিল্পকলার বিকাশের কথাও রয়েছে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ থেকে মানুষ যখন নগরভিত্তিক সমাজ গঠন করে তখন নগরের মানুষের মধ্যে এই জিনিসগুলোর চর্চা শুরু হয়েছিল।

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব

চলো, এইবার দক্ষিণ এশিয়া বা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে ভূপ্রকৃতির প্রভাব সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেই। বিষয়টি বুঝতে হলে দক্ষিণ এশিয়ার ভূখণ্ডটিকে স্পষ্ট করে চেনা দরকার।

উপরের মানচিত্রে তোমরা পৃথিবীর একাংশ দেখতে পাচ্ছ। মানচিত্রটিতে পৃথক রং দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান দেখানো হয়েছে।

ইতিহাসের আলোকে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রাচীনকালে যে ভূখণ্ড ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল সেই ভূখণ্ড এখন দক্ষিণ এশিয়া বা ভারতীয় উপমহাদেশ নামে পরিচিত। দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমানে মোট আটটি রাষ্ট্র রয়েছে। এগুলো হলো- আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং মালদ্বীপ। ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার রয়েছে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যার কারণে একে একটি 'অঞ্চল' হিসেবে গণ্য করা হয়। এই দক্ষিণ এশিয়ার পূর্ব অংশে 'বাংলা' নামে আরও একটি অঞ্চল রয়েছে যার কথা আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি।

নানান বৈচিত্র্যের মানুষ

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ভূ-খন্ডে যুগে যুগে নানান ভাষা, সংস্কৃতি আর নানান বৈচিত্র্যের মানুষ প্রবেশ করেছে। নানান বৈচিত্র্যের মানুষের পাশাপাশি অবস্থান, নানান প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকার লড়াই নিয়েই রচিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষের ইতিহাস।

দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে যেসব ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বসতি স্থাপন করেছিল তার মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের নাম। এরপর একের পর এক তিব্বতি, চৈনিক, আর্য ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা বসতি স্থাপন করেছে। মূলত খাদ্য, বাসস্থান এবং নিরাপত্তার সন্ধানে নানান বৈচিত্র্যের ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত করত।

হরপ্পা সভ্যতা: প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রথম নগর সভ্যতা

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অত্যন্ত উন্নত কিছু নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে প্রধান দুটি নগরের নাম হচ্ছে: মহেনজোদারো আর হরপ্পা। এই দুটো নগরের একটি বর্তমানে ভারত এবং অন্যটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে পড়েছে।

খননের ফলে নগর দুটোর মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে পরিকল্পিতভাবে তৈরি রাস্তা, বাড়িঘর, স্নানাগার, গোলাঘরসহ অনেক রকমের স্থাপনা। শুরুতে শুধু হরপ্পা এবং মহেনজোদারো নগরের খোঁজ পাওয়া গেলেও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই নগর দুটোর চিহ্ন ধরে আরও কিছু স্থানে খনন কাজ পরিচালনা শুরু করেন। এর ফলে ধীরে ধীরে বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে খুঁজে পাওয়া গেল মানববসতির আরও কিছু প্রাচীন চিহ্ন। এখনো অনেক নতুন নতুন স্থান খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

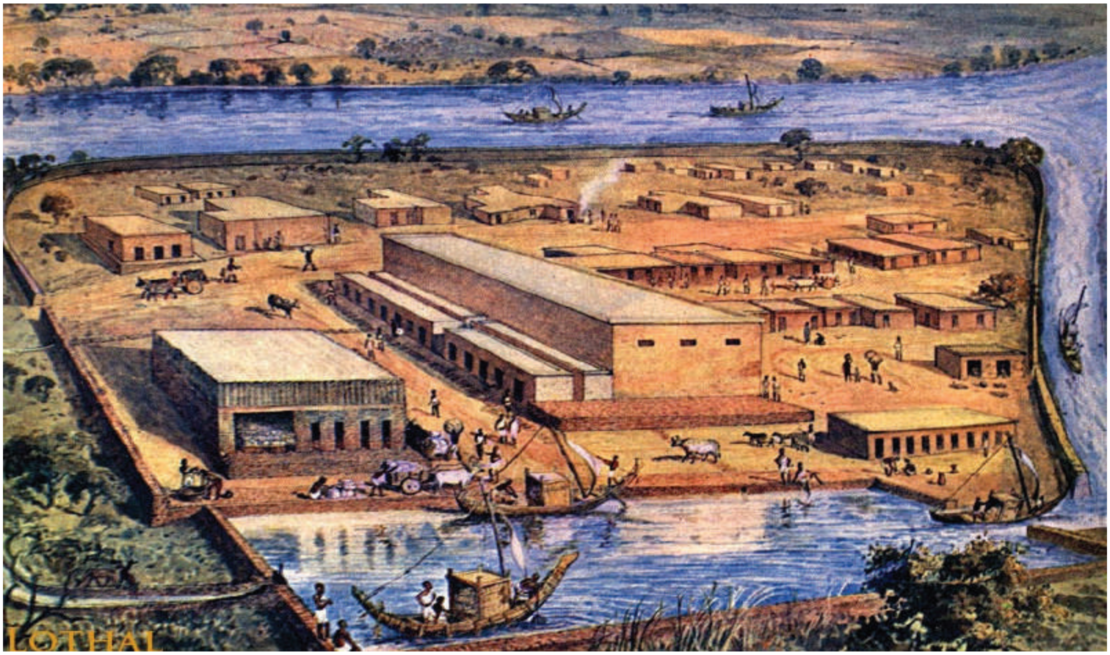

হরপ্পা সভ্যতার একেকটি নগর গড়ে উঠেছিল একেক ধরনের ভূপ্রাকৃতিক সুবিধা নিয়ে। ছবিতে আমরা হরপ্পা সভ্যতার একটি নগর দেখতে পাচ্ছি। এর নাম ছিল লোথাল। এটি ছিল মূলত একটি সমুদ্র-বন্দর। শিল্পীর চোখে আঁকা বন্দর-নগরী লোথাল।

হরপ্পা-মহেনজোদারো নগরসহ আরও বসতির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে সিন্ধু নদী তীরবর্তী এলাকায়। মূলত কৃষিকে কেন্দ্র করেই এখানে প্রথম মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে কৃষি থেকে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বড়ো বড়ো নগরের উৎপত্তি হয়েছে।

হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে আরও একটি চমৎকার তথ্য জেনে নিই চলো। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা সম্পর্কে জানতে শুরু করলেই দেখা যাবে অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার জন্ম হয়েছে কোনো না কোনো একটি নদীর তীরে। কিছু কিছু সভ্যতা আবার গড়ে উঠেছে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায়। সেই হিসেবে হরপ্পা সভ্যতার বিকাশে ভিন্ন রকমের কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। কেননা এখানে একই সঙ্গে অনেকগুলো বসতি গড়ে উঠেছিল এবং বসতিগুলো কেবল নদী তীরেই নয়, বরং পাহাড়ি এলাকা, শুষ্ক মরুভূমি এবং সাগর উপকূলেও ছড়িয়ে ছিল। বিভিন্ন ধরনের ভূপ্রকৃতিতে এই সভ্যতার বিভিন্ন ধরনের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। হরপ্পা সভ্যতাকে এইজন্যই কেবল নদী প্রভাবিত সভ্যতা বলা ঠিক হবে না।

একটি নৌকার অনুকৃতি। পোড়ামাটিতে তৈরি এই ছোটো নৌকার আকার ও ধরন দেখে সেই সময়ের হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নগর ও বসতির মধ্যে নদীপথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত নৌকা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

সভ্যতার যেমন উত্থান হয়, তেমন পতনও হয়। অনেকেই মনে করেন, হরপ্পার নগরগুলোতে একসময় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। ফলে এর পতন হয়। হরপ্পা সভ্যতার পতনের পেছনে ভৌগোলিক কারণকেও খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। বলা হয়, কৃষিকে কেন্দ্র করে এই সভ্যতাগুলোর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছিল। প্রকৃতির খেয়ালে একসময় হয়ত নদীগুলোর গতিপথ বদলে গিয়েছিল, বৃষ্টি কম হচ্ছিল, মরুভূমি বেড়ে যাচ্ছিল। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কমে যাচ্ছিল। শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থা গতি হারাচ্ছিল। আর সেই জন্যই একসময় মানুষ এই নগরগুলো ত্যাগ করে অন্য স্থানে চলে যেতে শুরু করেছিল।

বিশ্বের ইতিহাস ও সভ্যতায় ভূপ্রকৃতির প্রভাব

আমরা এখন পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করবো।

এই তথ্য আমাদের কাছে অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, আদিম গোত্র জীবনে শিকার বা সংগ্রহ ছিল জীবন ও জীবিকার একমাত্র মাধ্যম। ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সবাই মিলে যেটুকু শিকার বা সংগ্রহ করত তা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে সমানভাবে ভাগ করে নিত। পৃথক কোনো সম্পত্তির ধারণা না থাকায় সবার মধ্যেই এক ধরনের সমতার ভাব বিরাজ করত। মানুষের জীবন ধারণের প্রতিটি উপাদানই সংগ্রহ করা হতো প্রকৃতি থেকে। প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাদ্য ও পশু শিকার করে মানুষ প্রকৃতির আশ্রয়েই নিজেদের সুরক্ষিত রাখার উপাদান খুঁজে বেড়াত। ধীরে ধীরে মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এরই মধ্য থেকে খুঁজে বের করে নিত বেঁচে থাকার মতো কৌশল। লক্ষ লক্ষ বছরে অর্জিত মানুষের যোগ্যতা আর দক্ষতায় পৃথিবীতে ঘটে প্রথম বিপ্লব- কৃষি বিপ্লব। তারপরেই শুরু হয় নগর বিপ্লব।

পৃথিবীর মানচিত্র

পৃথিবীতে নগর সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে মিশরীয়, মেসোপটেমিয়, সিন্ধু, চীন, এসেরীয়, রোমান, মায়া সভ্যতা ইত্যাদি। এই সভ্যতাগুলো গড়ে উঠার পেছনেও রয়েছে ভৌগোলিক উপাদান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব।

আফ্রিকা মহাদেশে বিকশিত মিশরীয় সভ্যতা আর ইউরোপে বিকশিত গ্রিক সভ্যতায় ভূপ্রকৃতির প্রভাব সম্পর্কে কিছু তথ্য সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক। ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ইতিহাস অনুসন্ধানে এসব সভ্যতার অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারব।

মিশরীয় সভ্যতা: বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম নগরসভ্যতা

মিশরীয় সভ্যতা আফ্রিকা মহাদেশের মিশরে নীল নদের তীরে বিকশিত হয়েছিল। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীল নদ। এটি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে উৎপত্তি লাভ করে নানান দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভূ-মধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। কৃষি কাজ থেকে শুরু করে মিশরীয়দের ধর্ম, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও নীল নদের প্রভাব ব্যাপক। এর সত্যতা অনুধাবন করে ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিশর দেখেছেন, তিনি অবশ্যই উপলব্ধি করেছেন যে, মিশর নীল নদের দান।'

মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান। নীলনদের প্রবাহ ও বন্যার কারণে যে বিশাল সমতলভূমি তৈরি হয়েছিল সেই উর্বর জমিতে বিভিন্নভাবে চাষাবাদ করা হতো। এই চাষাবাদই ছিল মিসরীয় সভ্যতা বিকাশের অন্যতম প্রধান প্রভাবক। উপরের ছবিতে লাঙল দিয়ে গরুর মাধ্যমে চাষাবাদ করা, বীজ বপন করার ছবি আছে। নীলনদের কাছে কীভাবে বসতিগুলোর চারপাশে জমি চাষাবাদ করে ফসল ফলানো হতো তার কাল্পনিক ছবি আছে। আরও আছে ছোটো ছোটো খাল বা নালা তৈরি করে পানি নিয়ে গিয়ে ঝুড়ি বা পাত্রের মাধ্যমে সেচ দেওয়ার চিত্র

আজ থেকে হিসাব করলে আনুমানিক ৬ হাজার বছর আগে মিশরীয় সভ্যতার সূচনা। নীল নদের পানি এবং নদ-তীরবর্তী উর্বর পলিমাটির আশ্রয়ে কৃষিকে কেন্দ্র করেই এই সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই সভ্যতার মানুষেরা শিল্প এবং বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাতেও মিশরীয়রা খুব উন্নতি লাভ করেছিল। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের লক্ষণ এবং নীল নদের জোয়ার-ভাটার সঙ্গে এদের প্রভাব নির্ণয় করে মিশরের জ্যোতির্বিদরা চন্দ্রপঞ্জিকা রচনা করেছিল। চন্দ্রপঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী তারা ৩৫৪ দিনে বছর গণনা করত। পরবর্তীকালে লুব্ধক নক্ষত্রের আবির্ভাব পর্যবেক্ষণ করে ৩৬৫ দিনে বছর গণনার হিসাব ধরে সৌর পঞ্জিকা চালু করা হয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

নীলনদের উর্বর উপত্যকায় কৃষিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা। ধীরে ধীরে এটি শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে উন্নত নগরসভ্যতায় পরিণত হয়। নীলনদের পাড়ে গড়ে তোলা থিবস নগর ও সংলগ্ন বিভিন্ন মন্দির ও স্থাপনা কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

গ্রিক সভ্যতা: সমুদ্র তীরে গড়ে উঠা একটি নগরসভ্যতা

প্রাচীন যে সভ্যতাগুলো নদীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষিপণ্যের প্রাচুর্যের উপর ভিত্তি করে ধীরে ধীরে সেখানে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল। অন্যদিকে প্রাচীন গ্রিক ও ফিনিশীয় সভ্যতার জন্ম হয়েছিল ভূ-মধ্যসাগরের তীরবর্তী একেকটি ভূ-খন্ডকে আশ্রয় করে। সমুদ্রের তীরবর্তী

এই সভ্যতাগুলোর চারপাশে ছিল না বিস্তৃত চাষের জমি কিংবা সেচের সুবিধা। এই সভ্যতাগুলোতে তাই অর্থনীতির বিকাশ ঘটে ভিন্নভাবে। সমুদ্র থেকে মাছ, মণিমুক্তা এবং অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহে তারা দক্ষতা অর্জন করেছিল। পার্বত্য এলাকা থেকে কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠ দিয়ে জাহাজ নির্মাণ করে সমুদ্রপথে বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এরা নিজেদের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলেছিল।

অসংখ্য পাহাড় দিয়ে বিচ্ছিন্ন ছিল গ্রিসের ভূমি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গ্রিসের বিভিন্ন অংশে পৃথক যে জনবসতিগুলো গড়ে ওঠে তার একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক ছিল শিথিল। যোগাযোগ ছিল সীমিত। গ্রিসের এইসব স্বতন্ত্র অংশেই ধীরে ধীরে বেশ কিছু নগর রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই সব নগর রাষ্ট্রের মধ্যে স্পার্টা এবং এথেন্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্য গ্রিসের পার্বত্য ও অনুর্বর একটি এলাকায় বিকাশ ঘটেছিল এথেন্স নামের নগর রাষ্ট্রের।

গ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সমুদ্রের তীরে। এই সভ্যতাটি ছিল মূলত অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি। নগর-রাষ্ট্রগুলোও গড়ে উঠেছিল একেকটি দ্বীপকে কেন্দ্র করে। উপরের মানচিত্রে গ্রিক সভ্যতার নগর-রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান দেখানো হয়েছে।

প্রাচীন গ্রিসের প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হলো পর্বত, সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপমালা। মূলত গ্রিস সভ্যতা ছিল অনেকগুলো দ্বীপরাষ্ট্রের সমন্বয়। এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন সময় দ্বন্দ্ব-সংঘাতে যেমন লিপ্ত হয়েছে, তেমনি আবার সংঘবদ্ধ হয়েও নানান কাজ করেছে। যে কারণে এ সভ্যতায় ছোটো ছোটো নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল।

আনুমানিক ১২০০ প্রাক-সাধারণ অব্দ থেকে সূচিত হয়ে প্রাক-সাধারণ অব্দ ৫০০ পর্যন্ত সময়ে গ্রিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল।

প্রচলিত ও অপ্রচলিত উৎস

ইতিহাস জানার প্রধান উপায় হিসেবে উৎস বা উপাদান দরকার। সেই বিষয়ে আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতে কিছু তথ্য জেনেছি। প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই সময়ের মানুষের গড়ন সম্পর্কে যেমন তথ্য পাওয়া যায়, তেমনি মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও অন্যান্য সামগ্রী (যেমন- টেরাকোটা, মৃৎপাত্র, স্থাপত্য নিদর্শনাবলি ইত্যাদি) থেকেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানান তথ্য পাওয়া যায়। এসবই হচ্ছে অপ্রচলিত বা অলিখিত উৎস। অন্যদিকে, যেকোনো লিখিত নিদর্শনাবলি (যেমন-বইপত্র, জমি বিক্রি বা দানের দলিল, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইত্যাদি) থেকেও আমরা বিভিন্ন তথ্য পেয়ে থাকি। এগুলোকেই মূলত ইতিহাসে প্রচলিত বা লিখিত উৎস বলা হয়ে থাকে। চলো, উপরের পাঠ অনুসন্ধান করে এবং শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে ইতিহাসের তথ্য জানা যায় এমন উৎসগুলো শনাক্ত করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

লিখিত উৎস	অলিখিত উৎস
দলিল	কঙ্কাল

প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম

আনুচিং মগিনি ক্লাসে মন খারাপ করে বসে ছিল। মিলি এসে জিজ্ঞাসা করল কিরে তোর মন খারাপ কেন? আনুচিং বলল, স্কুলে আসার পথে নদীর ধারে সে খুব একটা বাজে ঘটনা দেখে এসেছে, তাই তার মন খারাপ। মিলি বলল, আমি না তোর বন্ধু আমাকে বল কী দেখেছিস? আনুচিং বলল, দেখলাম, নদীতে জেলেরা মাছ ধরার সময় একটি শুশুক (মিঠা পানির ডলফিন) ধরা পড়েছিল! তীরে নিয়ে আসার পর সেখানে অনেক লোক জমে যায়। তারপর একদল দুষ্টু লোক শুশুকটাকে চিনতে না পেরে ভয়ংকর কোনো প্রাণী ভেবে মেরে ফেলেছে!

ছবি: শুশুক (মিঠা পানির ডলফিন)

খুশি আপা ক্লাসে ঢুকে ওদের কথা শুনতে পেয়ে বললেন, আনুচিং তুমি খুবই একটা দুঃখজনক ঘটনা দেখতে পেয়েছ। প্রতিদিনই সারা পৃথিবীতে অসংখ্য বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী মানুষের সচেতনতার অভাবে মৃত্যুবরণ করছে। বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আসলে আজ আমরা এই বিষয় নিয়েই কাজ করব।

প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংসের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা

এরপর খুশি আপা সবাইকে নিচের বন্যপ্রাণির ছবিগুলো দেখালেন।

বেঙ্গাল ফ্লোরিক্যান

হায়েনা

ময়ূর

নীল গাই

বনরুই

শ্লথ ভালুক

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ছবির পাখি ও প্রাণীগুলো দেখতে কেমন লাগছে?

সবাই একযোগে বলে উঠল, ছবির প্রাণীগুলো খুবই সুন্দর।

আপা জানতে চাইলেন, এই প্রাণীগুলো কোন দেশে পাওয়া যায়?

এবার সবাই চুপ। আসাদ বলল, আমি এদের মাঝে ময়ূর, ভালুক আর হায়েনা দেখেছি চিড়িয়াখানায়। কিন্তু বাকিদের কখনো দেখি নি। খুশি আপা হেসে বললেন, চিড়িয়াখানায় যাদের দেখতে পাই তারা নয়, প্রকৃতিতে?

তারপর বললেন, কেমন হতো যদি এই প্রাণীগুলো আমাদের দেশের বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়াত? কিন্তু সেটা হয়ত আর কখনোই সম্ভব হবে না, কেননা বাংলাদেশে এ ধরনের আর একটি প্রাণীও বেঁচে নেই, এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ কিছু দিন আগেও এদের অনেকেই বসবাস করত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ধরা যাক ময়ূরের কথা। মাত্র ১০০ বছর আগেও এরা কাক বা শালিখের মতো ঘুরে বেড়াত সাভারসহ সারাদেশের শালবন ও অন্যান্য বনাঞ্চলে।

এবার খুশি আপা একটু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জানো কেনো এই সুন্দর সুন্দর প্রাণীরা বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল? উত্তরে সবাই আবারও চুপ করে রইল। শুধু শফিক বলল, মনে হয় মানুষ অনেক গাছপালা কেটে ফেলাতে বন্যপ্রাণিগুলো থাকার জায়গা না পেয়ে অন্য দেশে চলে গেছে। খুশি আপা এ বিষয়ে কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, এসো আবারও আমরা কয়েকটা ছবি দেখি।

ছবির নাম:__________________

ছবির নাম:__________________

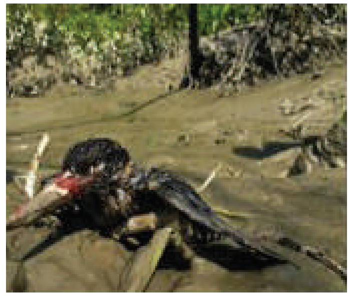

ছবির নাম:__________________

ছবির নাম:__________________

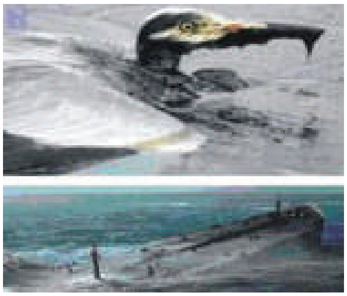

ছবির নাম:__________________

ছবির নাম:__________________

ছবিগুলো দেখা হলে তিনি বললেন,

- ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? প্রত্যেকটি ছবির জন্য একটি করে নাম ঠিক করো এবং ছবিগুলোর নিচের শূন্যস্থানে লেখো।
- ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে তার সাথে তোমরা কি বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও? উত্তর হ্যাঁ হলে, কী সম্পর্ক রয়েছে তা কি বলতে পার?

তারপর বললেন—চলো, এ প্রশ্ন দুটির উত্তর আমরা দলগতভাবে খুঁজে বের করি। এরপর সবাই ৫/৬ জনের ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ১০ মিনিট আলোচনা করে প্রশ্ন দুটির উত্তর লিখল এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করল।

চলো আমরাও ওদের মতো আমাদের বন্ধুদের সাথে দলগতভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।

১. ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? প্রত্যেকটি ছবির জন্য একটি করে নাম ঠিক করো এবং ছবির নিচের শূন্যস্থানে লেখো।

____

____

২. ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে তার সাথে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্পর্ক তোমরা কি খুঁজে পাও? উত্তর হ্যাঁ হলে, কী সম্পর্ক রয়েছে তা কি বলতে পার?

____

____

প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম :

সবার কাছ থেকে খুশি আপা জানতে চাইলেন যে,

- এসব সমস্যার পেছনে কার ভূমিকা রয়েছে?
- এসব সমস্যা দূর করতে হলে কাকে ভূমিকা পালন করতে হবে?

চলো আমরাও এ প্রশ্নগুলোর উত্তর ভেবে বের করি

তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে কাজ করলে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে বেশি ভূমিকা রাখতে পারব? উত্তরে সবাই বলল যে, সবাই মিলে কাজ করলে বেশি ভূমিকা রাখা যাবে। তখন সকলের উদ্দেশ্যে খুশি আপা বললেন, তাহলে আমরা প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারি, যেখানে সবাই মিলে কাজ করা যাবে। এই প্রস্তাবে সবাই খুব আনন্দিত হয়ে উঠল। আনুচিং বলল, দারুণ হবে, তাহলে আমরা অসহায় শুশুকদের রক্ষা করতে পারব! নাসির জিজ্ঞাসা করল যে তাহলে, আমরা কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করব? এ পর্যায়ে সবাই ইনক্লুসনের অর্থাৎ সবাইকে যুক্ত করার নীতিমালা অনুযায়ী দলে বিভক্ত হয়ে নিচের “শ্যামলী” গল্পটি পড়ল।

শ্যামলী

অনেক অনেক দিন আগের কথা। জায়গাটা কোথায় তা নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। এক দেশে এক থই থই জলের মায়াবী নদীর ধারে খুব সুন্দর একটা গ্রাম ছিল। নাম ছিল তার শ্যামলী। গ্রামের একদিকে নদী আর বাকি তিন দিকে ছিল ঘন সবুজ বন। গ্রাম আর বনে ছিল রং বেরঙের ফুল আর গাছপালা। ঐ গ্রামের ধারের বনে গাছে গাছে উড়ে বেড়াত সুন্দর সুন্দর সব কীট-পতঙ্গ আর পাখি। ঘুরে বেড়াত নানা রকমের বাহারি বন্যপ্রাণী। গ্রাম আর বনে কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি আর মানুষ মিলেমিশে সুখে শান্তিতে ছিল।

কিন্তু হলো কী? কয়েক বছরের ব্যবধানে দেখা গেল যে প্রথমে আস্তে আস্তে বনের ঘাস আর ছোটো ছোটো গাছ কমে যেতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে বড়ো বড়ো গাছপালাও কমতে লাগল। ওরা খেয়াল করল ধীরে ধীরে এলাকায় বৃষ্টিও কমে যেতে লাগল। গাছপালার সাথে সাথে কীট-পতঙ্গ আর পশু-পাখিও হারিয়ে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে বৃষ্টি এতই কমে গেল যে নদীর পানিও শুকাতে থাকল। চারপাশের সবুজ রং উধাও হয়ে শুকনো খটখটে বাদামি রং ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। নদীর পানি আর বৃষ্টি কমে যাওয়ায় ক্ষেতের ফসলও কমে যেতে লাগল। আশঙ্কা দেখা দিলো যে এ অবস্থা চলতে থাকলে কিছু দিনের মধ্যেই গ্রামের মানুষের খাবারও কমে যাবে। গ্রামটির অবস্থা এমনই প্রাণহীন বিবর্ণ হয়ে গেল যে বহু বছরের ব্যবধানে যারা গ্রামটিতে বেড়াতে আসত তারা প্রথমে দেখে চিনতেই পারত না যে এটাই তাদের সেই শ্যামলী নামের গ্রাম!

সবাই শুধু এটাই বলত যে কী সুন্দর গ্রামটা এখন কেমন হয়ে গেল! কিন্তু কেউই জানত না কী করলে শ্যামলী গ্রামের হারানো প্রাণ আবার ফিরিয়ে আনা যায়। এমনই যখন অবস্থা, তখন ঐ গ্রামের একদল ছেলেমেয়ে চিন্তা করল এ অবস্থার একটা পরিবর্তন দরকার! ঠিক করল তারা তাদের গ্রামের হারিয়ে যেতে বসা সবুজ গাছপালা, রং বেরঙের পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ আর জল থই থই নদী আবার ফিরিয়ে আনবে, কিন্তু তারা জানে না কীভাবে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। একদিন তারা আলোচনায় বসল, একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। নিজেদের মধ্যে কথা বলে ওরা বুঝল আসলে সমস্যাটা সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় কথাই তারা জানে না। আর তাই সেগুলো সমাধানও করতে পারছে না। ভেবে ভেবে তারা কয়েকটি বিষয় বের করল যার উত্তর না জানলে সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব হবে না। বিষয়গুলো হচ্ছে–

- আগে বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা এবং বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ কেমন ছিল?
- এখন বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা এবং বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ কেমন আছে?
- কেনই বা এসব কমে গেল?
- কি করলে আবার বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা এবং বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ বাড়বে?

সমস্যা সমাধানের প্রশ্নগুলো চিহ্নিত করতে পেরে তারা ভীষণ খুশি হলো। এবার তারা ভাবতে শুরু করল কোথায় গেলে, কার কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে পারে। তারা তাদের শিক্ষকের কাছে জানতে পারল যে, তাদের গ্রামে বনবিভাগের যে অফিস আছে সেখানকার লোকজন ও লাইব্রেরি বনের পশুপাখি আর গাছপালা নিয়ে কাজ করে। ওদের কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষকের কথামতো ওরা বনবিভাগের লাইব্রেরি ঘেঁটে অনেক বই আর রিপোর্ট খুঁজে পেল যেখানে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যেতে পারে। বই আর রিপোর্টগুলো নিয়ে তারা সবাই মিলে বেশ কিছু দিন পড়াশোনা করার পর তাদের বন আর বনের গাছপালা ও পশুপাখি বিষয়ক অনেক কিছু জানতে পারল। সেখানকার লোকজনের কাছ থেকে কিছু জানতে পারলেও তাদের বদলির চাকরি বলে অতীত সম্পর্কে বেশি কিছু তারা বলতে পারে নি। তাছাড়া মুশকিল হলো, যে বিষয়গুলো তারা জানল সেগুলো সবই তাদের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বই ও রিপোর্টগুলো থেকে তারা সমস্যা তৈরি হওয়ার আগে বনের গাছপালা ও পশুপাখির সংখ্যা কত ছিল আর বর্তমানে এই সংখ্যা কত তা সবই জানতে পারল। তারা খেয়াল করল এক সময় হঠাৎ করেই বনে গেছো বাঘ, বনবিড়াল, শিয়াল এসব প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। তারপর বনের গাছপালাও কমতে থাকে। এদিকে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা আবার বাড়তে থাকে। কিন্তু এসব কিছুর সাথে শ্যামলী গ্রামের সমস্যার কোনো সরাসরি যোগাযোগ তারা খুঁজে পায় না।

সবকিছু নিয়ে তারা আবার হাজির হয় শিক্ষকের কাছে। সব শুনে শিক্ষক তাদের বললেন যে, এখন আসলে তাদের কথা বলতে হবে এমন একজন মানুষের সাথে যিনি বন আর বনের পশুপাখিদের সম্পর্ক খুব ভালো বোঝেন। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকদিনের মধ্যে বনবিভাগের অফিসে একজন বিশেষজ্ঞের আসার কথা যিনি বন্যপ্রাণী আর পরিবেশ নিয়ে গবেষণা করেন। ছেলে-মেয়েরা নির্দিষ্ট দিনে ছুটে গেল সেই গবেষকের কাছে। গবেষক তাদের সব কথা আর প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, তোমাদের কথা শুনে মনে হয় আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। এক সময় বনে সব ধরনের গাছপালা আর পশুপাখিই একে অপরের উপর নির্ভর করে শান্তিতে বসবাস করছিল। একে বলে খাদ্য শৃঙ্খল। যেমন, ঘাস আর গাছপালা খাবারের জন্য নির্ভর করে রোদ, বৃষ্টি আর মাটির উপর। হরিণ, গরু, মহিষ এরা বেঁচে থাকে ঘাস লতাপাতা খেয়ে। অন্যদিকে বাঘ জাতীয় মাংসাশী প্রাণীরা খাবারের জন্য শিকার করত হরিণ, গরু, মহিষ প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীদের। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখনই যখন গ্রামের একদল শিকারি নিরাপত্তার অজুহাতে সব মাংসাশী প্রাণী মেরে ফেলে।

শিক্ষার্থীরা জিজ্ঞাসা করল, মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ার সাথে বর্তমান সমস্যার সম্পর্কটা কী? তিনি তখন বললেন খেয়াল করে দেখো, বনের সব পশুপাখি আর গাছপালাই একে অপরের উপর নির্ভর করে বাঁচে। মাংসাশীরা খাবারের জন্য শিকার করত হরিণ, গরু, মহিষ আর অন্য তৃণভোজী প্রাণীদের। বনে যখন আর এমন প্রাণী থাকল না তখন হরিণসহ তৃণভোজী প্রাণীদের সংখ্যা দুত বেড়ে গেল। এই জন্যই তোমরা রিপোর্টগুলোতে পেয়েছ যে, যখন মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা কমেছে তখন তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। শিক্ষার্থীরা বলল, এবার বুঝেছি! আর তৃণভোজীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতেই গাছপালার সংখ্যা কমে গেছে দ্রুত। কারণ, বেশি সংখ্যক তৃণভোজীরা বেশি বেশি গাছপালা খেয়ে ফেলেছে। গবেষক বললেন, একদম ঠিক ধরেছ। আর গাছপালা কমে যাওয়াতেই এই এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে গেছে। ফলে নদীর পানিও কমেছে। চারপাশ শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। তারা খুব উৎফুল্ল হয়ে বলল, এখন আমরা সমস্যাটি কীভাবে তৈরি হয়েছে তা অনুসন্ধান করে বের করতে পেরেছি। এবার আমাদের বের করতে হবে, কীভাবে সমস্যাটির সমাধান করা যাবে।

চলো 'শ্যামলী' গল্পটি পড়ে আমরা নিজেরা চিন্তা করে বের করি কীভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করা যায়?

সব দল তাদের উত্তর উপস্থাপন করার পর খুশি আপা জানতে চাইলেন যে, তারা তাদের ক্লাবের জন্য কী ধরনের কাজ নির্ধারণ করতে চায়?

এ পর্যায়ে ওরা আবারও ৫/৬ জনের দলে বিভক্ত হয়ে সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য কাজ কী হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করল। দলে কাজ করা শেষ হলে প্রত্যেক দল তাদের তালিকা পোস্টার পেপারসহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করল। উপস্থাপনার পরে আলোচনার মাধ্যমে ওরা সব দলের তালিকা যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়নযোগ্য কাজের তালিকা তৈরি করল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সদস্যরা একক ও দলগতভাবে সারা বছর ধরে কাজগুলো বাস্তবায়ন করবে।

চলো এবার আমরাও নিজেদের মতো করে নিজ নিজ এলাকার বাস্তবতা অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্র চিহ্নিত করি

(নিচে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হলো বোঝার সুবিধার্থে, চাইলে এগুলো রাখতেও পার আবার বাদ দিয়ে অন্য কাজের কথা ভাবতে পার।)

- ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ
- বন্য পশুপাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ
- নিজের বিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকায় ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা
- ______________________
- ______________________
- ______________________
- ______________________

কাজের তালিকা তৈরি শেষ হলে, খুশি আপা বললেন, কী কাজ করব তা তো ঠিক করা হলো!

মূল্যায়ন

এবার চলো আমরা নিচে যুক্ত আত্মমূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন করি।

ক্রম	কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পর	সম্পূর্ণ একমত	মোটামুটি একমত	একমত নই
১।	আমি অন্তত পক্ষে ৩টি স্থানীয় বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী সম্পর্কে জানতে পেরেছি			
২।	আমি/আমরা-প্রাণী/বন্যপ্রাণী/পরিবেশ রক্ষায় অন্তত: পক্ষে ১টি উদ্যোগ গ্রহণ করেছি			
৩।	প্রকৃতি সম্পর্কে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে			
৪।	বন্যপ্রাণীর প্রতি আমার ভালবাসা আগের চেয়ে বেড়েছে			
৫।	আমি ভবিষ্যতে প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ			
৬।	আমি বিশ্বাস করি আমার কাজে ক্লাব উপকৃত হয়েছে			
৭।	প্রকৃতি ও পরিবেশ কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পেরেছি			
৮।	প্রকৃতি ও পরিবেশের বিলুপ্তির অন্তত ৩টি কারণ সম্পর্কে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি			

আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ

পত্রিকা পড়তে পড়তে সেদিন নাসিরের বাবা ওর মাকে বলছিলেন, সরকার গণহত্যার স্থানগুলো চিহ্নিত করে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। তখন কথাটা সে অতটা খেয়াল না করলেও বিকেলে সহপাঠী মানিকের সাথে খেলার মাঠে যাওয়ার সময় কথাটা তার মাথায় আসে। হাঁটতে হাঁটতে তখন ও মানিককে জিজ্ঞেস করল, তোর দাদা না একাত্তরে শহিদ হয়েছিলেন? ঘটনাটা জানিস তুই? মানিক বলল, সবটা ভালো জানি না। জানি যে শুধু ওনাকে নয়, সেদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা মিলে পাড়ার ৪৬ জন নারীপুরুষকে হত্যা করেছিল। সেই থেকে ঐ পাড়াটা তো পরিত্যক্ত। আমরা এবং তেইশটা পরিবার দক্ষিণের চরে ঘর তুলে থাকি।

তুই চিনিস গণহত্যার জায়গাটা? বলল নাসির। মানিক তক্ষুণি জবাব দিলো—চিনি না আবার। নাসির বলল, চল তাহলে সেখানে যাই। দক্ষিণের চর পেরিয়ে জংলা জায়গাটায় গিয়ে ওরা দেখে সেখানে তাদের এলাকার ইউএনও, ইউপি চেয়ারম্যান ও আরও কয়েকজন মিলে কি যেন দেখছেন, কথাবার্তা বলছেন। কাছে যেতেই তারা চিনল ইউপি চেয়ারম্যান হারুণ চাচাকে। কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল নাসির, কী হচ্ছে চাচা এতো দূরের এই নির্জন জায়গায়? হারুণ চাচা বললেন, ওমা তোমরা জান না, একাত্তরে আমাদের গ্রামে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটেছিল। তার দশ-বারো দিন পরে একদিন বিশ্বাসঘাতক দেশীয় রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে তারা গ্রাম অবরোধ করে আর ৪৩ জনকে বেঁধে এইখানে এনে গুলি করে হত্যা করেছিল। মানিক বলল, এটা তাহলে বধ্যভূমি? তখন ইউএনও অনুপম বড়ুয়া কাছে এসে বললেন, সরকার সারাদেশের গণহত্যার স্থান ও বধ্যভূমিগুলো চিহ্নিত করছে। শহিদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হবে। আমাদের এখানেও একটা হবে।

শুনে ওরা খুব খুশি হলো। কিন্তু একইসাথে তাদের মনে অনেক প্রশ্নও জাগল, কেন যুদ্ধ হলো, কেনইবা গ্রামের মানুষকে হত্যা করা হলো? কতদিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল? কারা নেতৃত্ব দিয়েছেন? সব কথা তারা জানতে চায়। মানিক বলল, এ ইতিহাস আমাদের জানতেই হবে। নাসির একই সুরে বলল, হ্যাঁ সব ঘটনা ভালোভাবে বিস্তারিত জানতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমরা জানতে চাই

পরদিন স্কুলে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসে খুশি আপাকে পেয়ে তারা সবাই একসাথে অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করল। খুশি আপা একটু থেমে বললেন, থামো! থামো! আমাকে বুঝতে দাও আগে। তার মানে তোমরা আমাদের গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বিলের ধারে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যে বধ্যভূমি আছে সেখানে গিয়েছিলে। খুব ভালো একটা কাজ করেছ তোমরা। আচ্ছা, তোমরা তো জানো যে, ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানিদের সাথে। তোমাদের প্রশ্নগুলো শুনে মনে হচ্ছে তোমরা আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ। কিন্তু কীভাবে আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি বলো তো?

নাসির বলে উঠল, কীভাবে আর, অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে।

খুশি আপা বললেন, চমৎকার! তাহলে চলো আমরা একটি অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি!

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা

সমস্যা চিহ্নিতকরণ/অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন

এরপর খুশি আপা বললেন, এসো আমরা এবার আমাদের সবার আগ্রহের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভাবি। সবাইকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করলেন, যার কিছু আমাদের জানা, কিছু অজানা। তিনি বললেন,

তোমরা কি জানো–

ক) আমাদের দেশ কীভাবে স্বাধীনতা পেয়েছে?

খ) কেন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে?

গ) কখন এবং কত দিন ধরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে?

গ) কার নেতৃত্বে, কীভাবে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?

ঘ) শুধু কি বিখ্যাত মানুষেরাই মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিলেন? আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা কি কোনো অবদান রেখেছিলেন? তোমাদের পরিচিত কেউ কি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ অথবা সহযোগিতা করেছিলেন?

ঙ) করলে, কী ধরনের ভূমিকা রেখেছিলেন?

শহিদ আজাদের গল্প শুনি

এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে খুশি আপা মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদান নিয়ে বলতে গিয়ে শহিদ আজাদের গল্প বললেন–

তোমরা হয়ত অনেকে শহিদ আজাদ এর কথা শুনেছ। তাঁর পুরো নাম মাগফার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী আজাদ। মুক্তিযুদ্ধের সময় আজাদ ছিল তরতাজা এক তরুণ। কম বয়স হলেও সে ছিল ক্র্যাক-প্ল্যাটুন নামে একটি গেরিলা দলের ভীষণ সাহসী এক সদস্য। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাতে বিন্দুমাত্র ভয় পেত না। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আজাদ পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যায়। আজাদের মা অনেক খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারেন যে, আজাদকে রমনা থানায় আটকে রাখা হয়েছে। তিনি থানায় গিয়ে দেখেন আজাদকে এমনই অত্যাচার করা হয়েছে যে, আজাদ উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

শহিদ আজাদ

মাকে দেখে সে বলল যে, যদি সে তার গেরিলা দলের বাকি সদস্যদের খবর জানায় তাহলে তাকে ছেড়ে দেবে। আজাদের মা তখন আজাদকে বলেন জীবন গেলেও যেন আজাদ অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ঠিকানা না বলে। আজাদ সম্মত হয়। দীর্ঘ অনাহারে শীর্ণ আজাদ মায়ের কাছে ভাত খেতে চেয়েছিল। আজাদের মা ভাত নিয়ে ফেরত এসে আজাদকে আর খুঁজে পান নি কখনো। আজাদের মা এরপর যে ১৪ বছর বেঁচে ছিলেন কখনো আর ভাত খান নি।

এ তো গেল এক শহিদ আজাদের কথা। এরকম হাজারো শহিদ আজাদ আমাদের প্রতিটি এলাকায় ছড়িয়ে আছেন। আমরা কি কখনো জানব না আমাদের এলাকায় ছড়িয়ে থাকা এমন বীর শহিদদের কথা? এমন বীর মায়েদের কথা?

নিশ্চয়ই জানব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জানব কীভাবে? আমাদের এলাকার এই ইতিহাস তো কোথাও লেখা নেই। আমরা কি শুধু অন্যদের খুঁজে পাওয়া ইতিহাস পড়াতেই সীমাবদ্ধ থাকব? না নিজেরাই বিস্মৃতির অতল থেকে হারাতে বসা ইতিহাস খুঁজে বের করে আনব? কেমন হয়, যদি আমরা আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত করি?

- ক্লাসের সবাই একসাথে বলে উঠল, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত করতে চাই!
- খুশি আপা তখন বললেন, আমাদের এলাকার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তোমরা কী কী জানতে চাও?
- নাসির বলল, কী ঘটেছিল? পাকিস্তানিরা এই এলাকায় কী অত্যাচার করেছিল?
- আয়েশার প্রশ্ন, এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা কী করেছিল?
- ফ্রান্সিসের জানতে চাওয়া–সাধারণ মানুষ কী করেছিল?

সবার প্রশ্ন বোর্ডে লিখে নিয়েছিলেন খুশি আপা। আলোচনা শেষে সবার প্রশ্নগুলোকে কয়েকটি মূল প্রশ্নে ভাগ করা হলো। সবাই মিলে অনুসন্ধানী কাজের মধ্য দিয়ে এগুলোর উত্তর খুঁজে বের করবে। যেমন–

মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর কী রকম অত্যাচার হয়েছিল?

মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল?

সাধারণ মানুষ কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল?

চলো নাসির, আয়েশা ও তার বন্ধুদের মতো আমরাও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের অনুসন্ধানী কাজের পরিকল্পনা করি।

প্রস্তুতি (দলগঠন ও কর্মপরিকল্পনা)

মিলি জানতে চাইল যে, কাজটি আমরা কীভাবে করব? একা একা না সবাই মিলে?

খুশি আপা বললেন, কাজটি কীভাবে করলে ভালো হবে বলে তোমরা মনে করো?

ফ্রান্সিস বলল: একা একা কাজটি করা আমাদের জন্য বেশ প্রতিবন্ধক হতে পারে। আবার সবাই মিলে করতে গেলেও গোল বেধে যেতে পারে। ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে করলে ভালো হয়।

রাসেল বলল, ক্লাসে তো আমরা এক এক জন ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে এসেছি। আমার মনে হয় একই এলাকায় বাস করে এমন সবাইকে একই দলে রাখলে কাজ করতে সুবিধা হবে। আরেক বন্ধু মোবারক বলল, তবে সংখ্যাটি ৬ থেকে ৮ জনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেই ভালো হয়। বেশি হলে সবার অংশগ্রহণ কষ্টকর হতে পারে। এবারে মিলি বলল, তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই যাতে একই দলে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। খুশি আপা বললেন, এই তো তাহলে চল আমরা এসব বিবেচনায় নিয়ে এবার দল গঠন করে ফেলি। সবাই তখন যার যার এলাকা অনুযায়ী ৬ থেকে ৮ জনের দল গঠন করে ফেলল।

দল গঠনের আলোচনা শেষে খুশি আপা জানতে চাইলেন, ক্লাসে কারও পরিবারের কেউ কি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন?

রবিন বলল, আমার বড়ো চাচা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন।

খুশি আপা রবিনকে তার চাচার শহিদ হওয়ার ঘটনা সবাইকে শোনানোর অনুরোধ করলে রবিন সবাইকে ঘটনাটা বলল।

এ পর্যায়ে খুশি আপা জানতে চান যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই অঞ্চলে যে এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল সেসব কথা কোথা থেকে জানা যেতে পারে?

সিয়াম বলল, এলাকার বিভিন্ন বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে।

ফ্রান্সিস বলল, পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব তথ্য আছে সেখান থেকে।

আয়েশা বলল, স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে। নাসিরের উত্তর, ওই সময়ের পত্রপত্রিকা থেকে। মিলি বলল, শুনেছি ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে অনেক তথ্য জানা যায়।

খুশি আপা এবার চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক কিনা তা কীভাবে জানব?

সবাই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। জয় বলল, আমরা কয়েক জায়গা থেকে তথ্য নিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারি, যদি মিলে যায় তাহলে বুঝবো প্রাপ্ত তথ্য সঠিক।

খুশি আপা বললেন, এবার পরিকল্পনার পালা। তোমরা নিশ্চয় ভুলে যাও নি এর আগে আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপসমূহ শিখেছিলাম। এখানে পরিকল্পনা করার জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপসমূহ ব্যবহার করতে পারি। এবার আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানী কাজটি কীভাবে করা যেতে পারে খুশি আপার সহযোগিতায় আয়েশা ও তার বন্ধুরা একটি পরিকল্পনা তৈরি করল।

এবারে চলো আমরাও ওদের মতো অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খুঁজে বের করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করি।

দলের নিয়ম-নীতি

খুশি আপা মূল কাজ শুরু করার আগে দীর্ঘমেয়াদি এই কাজে দলের সদস্যরা কোনো নিয়ম-নীতি মেনে চলবে কিনা জানতে চাইলে সবাই নানা রকম মতামত দিল। সেসব মতামত যাচাই-বাছাই করে শিক্ষার্থীদের পালনীয় নিয়ম-নীতির একটি তালিকা তৈরি করা হলো যা অনুসরণ করার জন্য সকলে একমত হলো। তারা যে তালিকা তৈরি করল তার কয়েকটি নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো। এগুলো নিয়ম-নীতির কিছু উদাহরণ মাত্র, চাইলে অন্যভাবেও পরিস্থিতি অনুযায়ী তোমরা নিয়ম-নীতি তৈরি করে নিতে পার। এবারে চলো আমরাও আমাদের কাজের জন্য সুবিধাজনক একটি নিয়ম-নীতির তালিকা তৈরি করি।

শিক্ষার্থীদের পালনীয় নিয়ম-নীতি

১.	কাজ করার সময় সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
২.	দলের সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা
৩.	নিজের মতামত প্রকাশে কখনো কোনো কারণেই দ্বিধা না করা
৪.	অন্যের মতামত শ্রদ্ধার সাথে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করা
৫.	দলগত কাজে ছেলে-মেয়ে ও সক্ষমতার ধরন নির্বিশেষে দলের সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
৬.	সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগেই সাক্ষাৎকারদাতার অনুমতি নেওয়া
৭.	
৮.	
৯	
১০	

বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ)

আজ খুশি আপা জানতে চাইলেন যে, এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যেসব ঘটনা ইতোমধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেসব কোথায় পাওয়া যাবে? এর উত্তরে সবাই মিলে যা বলল তা তালিকা করলে দাঁড়ায় এরকম–

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বই, পত্রিকা, প্রামাণ্যচিত্র, দলিলপত্র ইত্যাদি। সবাই মিলে আলোচনা করে তখন ঠিক করল যে, সব দল প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্ভাব্য উৎসের তালিকা তৈরি করবে এবং তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্য উৎসের তালিকা, অনুসন্ধান প্রক্রিয়াসহ প্রাপ্ত তথ্যাবলি নিয়ে খুশি আপার সাথে আলোচনা করবে।

পরদিন কাজের অবসরে আয়েশার বাসায় নাসির গিয়ে হাজির। ওরা সময় নষ্ট না করে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুসন্ধানী কাজ শুরু করে দিতে চায়।

আয়েশা বলল, এর আগে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা অনুসন্ধান করেছি, এই কাজেও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করলেই আমাদের হবে। আমার মনে হয় শুধু একটা বিষয় নিয়ে আলাদা করে ভাবা দরকার।

নাসির: কী সেটা?

আয়েশা: মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনুসন্ধান করতে হলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আগে জেনে নেওয়া দরকার। এর আগে অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে যে মৌলিক ধাপগুলোর কথা জেনেছিলাম সেখানে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ) বা ছাপানো বই, পত্র-পত্রিকা, দলিলপত্র পড়ে তথ্য সংগ্রহের ধাপটি ছিল না। অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিদ্যমান তথ্য জানা থাকলে নতুন কী তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নির্ধারণ করা সহজ হয়।

নাসির: তুমি ঠিকই বলেছ। আমার মনে হয় আমরা এ বিষয়ে কিছু বই পড়তে পারি। আর এমন কারও সাথে কথা বলতে পারি যে এ বিষয়ে খুব ভালো জানে। তাহলে তার কাছ থেকে কোনো বই, পত্রিকা এসবও পাওয়া যেতে পারে।

দুজনে সিয়ামদের বাসায় গিয়ে সিয়ামকে বলতেই সেও উৎসাহী হয়ে উঠল। তারপর তিনজনে মিলে সিয়ামের দাদাকে গিয়ে ধরল। তার দাদা বই পড়তে খুবই পছন্দ করেন। সিয়াম, নাসির আর আয়েশার কৌতূহল শুনে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে একগাদা মুক্তিযুদ্ধের বই বের করে আনলেন। তারপর সেগুলো থেকে মজা করে প্রশ্ন করে করে তার উত্তর বলার ঢংয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন।

চলো মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানি

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। তবুও জানতে ইচ্ছে করে এটি কেন মুক্তিযুদ্ধ? কেন এ যুদ্ধ হয়েছিল?

খুব সহজ কথা– মুক্তির জন্য যুদ্ধ। হ্যাঁ, এবার প্রশ্ন উঠবে, কার মুক্তি? কার কাছ থেকে? কেনই বা মুক্তির প্রশ্ন উঠল?

তোমরা আসলে জানো সবই। আমাদের মুক্তি, এই বাংলার অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের, জনগণের মুক্তি। মুক্তি চেয়েছি আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে। কেন চেয়েছি মুক্তি, তার অনেক কারণ আছে। সেই কারণগুলোও যে তোমরা জানো না তা নয়। একটু ভাবো, কিংবা চলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। ঠিক বেরিয়ে আসবে কারণগুলো।

সেটা বুঝতে হলে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা জরুরি তা হলো—

- মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন
- বৈষম্য ও বঞ্চনা
- প্রতিকারে ছয়দফার আন্দোলন
- ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
- ১৯৭০ এর নির্বাচনে বিজয় ও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র

বিষয়গুলো নিয়ে এই সব বই থেকে সংক্ষেপে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের শিক্ষক এবং অন্যান্য আরও অনেক বই-পুস্তক বা এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকেও কিছু জানতে পারবে

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তোমরা অনেকটাই জান। তবুও ছোট্ট করে বলি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই নতুন দেশের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সেই প্রশ্নটা ওঠে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৪৮ সালেই কেবল উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে ছাত্র জনতা এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাতে দেরি করে নি। বাংলা ছিল পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষের মাতৃভাষা। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্ববাংলার জনসংখ্যা ছিল অনেক বেশি, তারপরও রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে তাদের দাবি উপেক্ষিত হয়, এটা অন্যায়! দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাহিত্যিকরা তাই প্রতিবাদ জানান সঙ্গে সঙ্গে। ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ অধিকাংশ রাজনীতিবিদ এ আন্দোলনে সমর্থন দেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের জেদ এতটাই ছিল যে, ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আয়োজিত ছাত্রদের সমাবেশে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল, তাতে কয়েকজন নিহত হন। তাঁরা হলেন ভাষা শহিদ– আবুল বরকত, আব্দুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আব্দুল জব্বার ও শফিউর রহমান প্রমুখ।

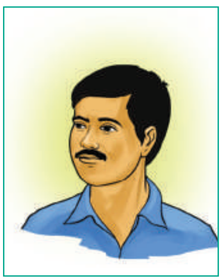
সালাম

রফিক

জব্বার

শফিউর

বরকত

শেষ পর্যন্ত বাংলাভাষার অধিকার রক্ষার দাবি পাকিস্তান সরকার মানতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। সাহিত্যিক আবুল ফজল তাই লিখেছিলেন– একুশ মানে মাথা নত না করা।

বঞ্চনা ও বৈষম্য

গোড়া থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য চালিয়ে আসছিল। কয়েকটা হিসাব তোমাদের দিচ্ছি, তা থেকে বিষয়টা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। তবে তার আগে বুঝে নেওয়া দরকার বৈষম্য বলতে কী বোঝায়? সহজ কথায় বৈষম্য মানে কোনো বিষয়ে সমতা বা ন্যায়সংগত ভাগ না হয়ে অন্যায়ভাবে প্রভেদ করা বা অসমভাবে বণ্টন করা। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

প্রথমত: পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দিতে অনীহা দেখায়।

দ্বিতীয়ত: পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় বাঙালির সংখ্যা ছিল খুবই কম।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের সরকারকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ৪২০০০ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ২৯০০ জন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে ৯৫৪ জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ১১৯ জন।

সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের কোটা ছিল পাঞ্জাবি ৬০%, পাঠান ৩৫% এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ ও পূর্ব পাকিস্তান মিলে অবশিষ্ট ৫%। অবশ্য বাঙালির দাবির মুখে এ সংখ্যা পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তিত হয়।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মোট ১৭ জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ১ জন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ৩০৫ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৩৩০ টাকা। ১৯৬৭-৬৮ অর্থবছরে এই বৈষম্য বেড়ে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হয় ৩৫২ টাকা অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩০ টাকায়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ প্রায় সকল ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্য কোম্পানির সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের বা বর্তমান বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ছিল ১১৩ কোটি রুপি। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫০০ কোটি রুপি। ১৯৫৬ সালে শুধু করাচির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় বাজেটের মোট ব্যয়ের ৫৬.৪% (৫৭০ কোটি টাকা) অথচ পুরো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় বাজেটের মাত্র ৫.১০%। নতুন রাজধানী ইসলামাবাদ নির্মাণের জন্য ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ব্যয় করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। অথচ প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা শহরের জন্য ব্যয় কর হয় মাত্র ২৫ কোটি টাকা। পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় এরকম অসংখ্য বৈষম্য সৃষ্টি করে । ফলে এর প্রতিবাদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

প্রতিকারে ছয়দফা

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও রাজনীতিকদের মধ্যে তখন সাহস ও উদ্যমে আস্থাভাজন নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এই বৈষম্য ও বঞ্চনার অবসান চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদ, সুযোগ ও অন্য সব বিষয়ে সমতা থাকুক। কেন আমরা অন্যায় মেনে নেবো? এটা তিনি মানতে পারেন নি। তাই তিনি ঘোষণা করলেন বিখ্যাত ছয়দফা দাবি। এটা ১৯৬৬ সালের কথা। এতে প্রত্যেক প্রদেশ যাতে যার যার সম্পদ ভোগ করতে পারে, রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের কাছে রাখতে পারে, খাজনার টাকায় প্রদেশের খরচ নির্বাহ করতে পারে এমন সব দাবি ছিল।

গণঅভ্যুত্থান

তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একজন সামরিক কর্মকর্তা– জেনারেল আইয়ুব খান। তিনি অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়ার হুমকি দিলেন। পরে শেখ মুজিবকে প্রধান করে ৩৫ জন আসামির বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা ঠুকে দিলেন। এটি ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। তাতে অবশ্য উল্টো ফল হলো। জনগণ তাদের প্রিয় নেতার মুক্তির জন্যে এমন আন্দোলন শুরু করল যে আইয়ুব খানকেই ক্ষমতা ছাড়তে হলো। তখন মানুষের মুখে মুখে শ্লোগান ছিল–জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব। এটিই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, এই আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রী ও জনতা একেবারে রাজপথ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তরুণ আসাদ ও কিশোর মতিউরসহ অনেকেই শহিদ হয়েছিল। পুলিশ, মিলিটারি নামিয়েও আন্দোলন থামানো যায় নি। এমনকি ছাত্র ও শ্রমিকের মৃত্যুতেও মানুষ পিছপা হয় নি। এই সময়ে মুক্ত শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

সত্তরের নির্বাচন

আইয়ুব খানের পরে আরেক সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান এলেন ক্ষমতায়। তিনি বুঝলেন আগের মতো চললে হবে না। তাই নতুন সংবিধান রচনা ও দ্রুত একটি জাতীয় নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখ। সরকার ভেবেছিল শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ কিছু আসন পেলেও দুই প্রদেশ মিলিয়ে সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। কিন্তু হলো কি, নিরঙ্কুশ বিজয় (অর্থ হচ্ছে বিরাট ব্যবধানে একচেটিয়া বিজয়। ইংরেজিতে landslide victory, শাব্দিক মানে ভূমিধস বিজয়) পেল আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের মোট ৩০০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট ১৬৯ জন। এই ১৬৯ জনের মধ্যে ২টি ছাড়া বাকি ১৬৭ জন সদস্যই নির্বাচিত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্য থেকে। দেখ পাকিস্তান জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা হলো ৩০০, তাহলে ১৫১ প্রার্থী বিজয়ী হলেই তো একটি দল সরকার গঠন করতে পারে। আওয়ামী লীগের ১৬৭ জন প্রার্থী জয় লাভ করেছে। ফলে তারাই কেন্দ্রে সরকার গঠন করার ন্যায্য দাবিদার। বঙ্গবন্ধু হবেন পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এটা পাকিস্তানি অধিকাংশ রাজনীতিক, মিলিটারি বা সামরিক কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা, আমলাতন্ত্র কিছুতেই মানতে পারে নি। ফলে তারা নানা রকম ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করে।

ওদের ষড়যন্ত্র আমাদের অসহযোগ

এইভাবে এসে গেল ১৯৭১ সাল। ঠিক হলো পয়লা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসবে। কিন্তু পাকিস্তানের তো সেই এক রোগ—বাঙালির নেতৃত্ব মানবে না। পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। তিনি কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার সাথে গোপন ষড়যন্ত্র আঁটলেন, তাতে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকেও যুক্ত করে নেয় তারা। মূল লক্ষ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা না দেওয়া। ভুট্টোর চাপে পয়লা মার্চের অধিবেশন বন্ধ করেন ইয়াহিয়া খান। আর তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষোভে ক্রোধে রাজপথে নেমে আসে। বঙ্গবন্ধুও জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন আর শুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে দুটো কথা বলে নিই। অসহযোগ মানে সহযোগিতা না করা। আর তা আন্দোলনে রূপ নেয় যখন কোনো জনগোষ্ঠী কোনো কর্তৃপক্ষের সাথে অসহযোগিতা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের সাথে অসহযোগিতার ডাক দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সরকারি কর্মীরা কাজে যোগ দেবেন না, সব অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে। এভাবেও সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করা যায়। ব্রিটিশ আমলে মহাত্মা গান্ধি এ ধরনের আন্দোলন প্রথম শুরু করেছিলেন।

৭ই মার্চের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশের সকল স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। খাজনা ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। ক্যান্টনমেন্ট ব্যতীত এ দেশে সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ এর মার্চে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে পূর্ণ অসহযোগিতা করে। ইতিহাসে এটা মার্চের অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত।

৭ই মার্চের ভাষণ

এই সময়ের আরেকটি বড়ো ঘটনা হলো ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সামনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। নেতার ওপর জনতার চাপ ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার। আর পাকিস্তান এমন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে তারা জনতা ও নেতা সবার ওপরই অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। তবে আমাদের নেতা ছিলেন দূরদর্শী অভিজ্ঞ মানুষ। পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্যে যেমন দাবি উত্থাপন করেছেন তেমনি জনগণকে ভবিষ্যত সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনাও দিয়েছেন। এমনকি গেরিলা যুদ্ধের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতেও ভোলেননি। শেষে তিনি বললেন—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এটিই ছিল সবার কাছে স্বাধীনতার বার্তা। আজ তাঁর এই ১৮ মিনিটের তাৎক্ষণিক বলা ভাষণটিকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে।

অপারেশন সার্চলাইট ও গণহত্যা

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে এবার ইয়াহিয়া ও তার দোসররা আন্দোলন থামাতে আলোচনার প্রস্তাব দিল। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু তাতে সায় দিলেন। কিন্তু আলোচনার আড়ালে তারা পূর্ব পাকিস্তানের সেনানিবাসগুলোতে সৈন্য সমাবেশ আর অস্ত্র জমা করেছে।

এক সময় তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আলোচনা ভেঙে দিয়ে ২৫ মার্চ সন্ধ্যার মধ্যে ইয়াহিয়া খানসহ ওরা ফিরে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে। আর সেদিন মধ্যরাতে শুরু হলো ইতিহাসের ভয়ংকর নির্মম হত্যাযজ্ঞ– অপারেশন সার্চলাইট। এতো বড়ো গণহত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। হানাদার পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের শিকার হলেন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশার মানুষ, লেখক, সাংবাদিক, কবি, শিল্পীরা। নয়মাস ধরে এ-ই চলেছে। এভাবে নয়মাসে ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছেন। বাঙালি নারীদের উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা বর্বরোচিত নির্যাতন চালিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত ও স্বাধীনতার ঘোষণা

এদিকে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি নিজ বাড়িতে অবস্থান করে ভাগ্যে যা থাকে তা বরণ করবেন। এ ব্যাপারে তাঁর দুটি বিবেচনা কাজ করেছে– প্রথমত, তিনি মনে করলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে না পেলে ঢাকা শহরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর মনে হয়েছে তিনি এতই পরিচিত একটি মুখ যে তাঁর পক্ষে আত্মগোপন করা সম্ভব নয়। পলাতক অবস্থায় ধরা পড়লে তা হবে লজ্জাজনক। এর চেয়ে সাহসিকতার সঙ্গে ওদের মুখোমুখী হলে সেটা সবার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। তবে গ্রেফতার হবার আগে ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার একটি ঘোষণা

প্রচারের জন্যে ইপিআর বাহিনীর কাছে প্রেরণ করেন। এই ঘোষণা ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রথমে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। পরে দেশের অন্যান্য জায়গাতেও এটি পাঠানো হয়েছিল। এটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। ঘোষণায় তিনি উল্লেখ করেন- ''ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন....'' তিনি নির্দেশনা দেন- দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকেও বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত যেন বাংলাদেশের জনগণ লড়াই চালিয়ে যায়। শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীন বাংলা বেতার

চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কর্মী প্রবীণ লেখক ও বেতারকর্মী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতার পক্ষে একটি বেতারকেন্দ্র চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী তাঁরা কাজ শুরু করেন এবং অনেকেই তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হন। এই কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন। পরে এটি আরও অনেকেই পাঠ করেছেন। কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রে পাকিস্তানিরা বিমান আক্রমণ চালালে প্রচার যন্ত্রটি সরিয়ে নেওয়া হয়। পরে কলকাতায় একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সারাদেশ থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা কলকাতায় এসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যুক্ত হন। যুদ্ধের নয় মাস ধরে এই কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগীত, কথিকা, নাটক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত রাখা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার

বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন সহকর্মী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা ও সংসদ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। একই সময়ে তিনি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে তাঁর সহযোগিতা চান। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই সরকারকে মুজিবনগর সরকার বা প্রবাসী সরকারও বলা হয়। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয় এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে তাঁর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান, ইউসুফ আলীসহ কয়েকজনকে নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করা হয়। এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যাত্রা শুরু হলো।

নয়মাসের যুদ্ধ ও বিজয়

যুদ্ধের সময় প্রাণ বাঁচাতে প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত কেবল তাদের আশ্রয়ই দেয় নি, বাংলাদেশ যে প্রবাসী সরকার গঠন করেছিল তাকে অফিসের জায়গা দিয়েছিল, গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়েছিল, নৌ কমান্ডো গঠন, বিমান বহর তৈরি, নিয়মিত বাহিনী গঠনে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারসাম্য রক্ষা ও অন্যান্য দেশের সমর্থন আদায়েও ভারত সরকার সচেষ্ট ছিল। শেষে বাংলাদেশের সাথে যৌথ বাহিনী গঠন করে সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের পরাজয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ভারতেরও প্রায় ৬-৭ হাজার সৈনিক এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান প্রবাসে হলেও মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনই ছিল এ সরকারের মূল লক্ষ্য। সেই অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্যে সরকারের কাঠামো তৈরি ও সে অনুযায়ী জনবল নিয়োগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রবাসী সরকারের মন্ত্রীর সংখ্যা কম হলেও মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা কম ছিল না। প্রবাসে আশ্রয় গ্রহণকারী সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতাদের সরকার পরিচালনার কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। জুলাই ও সেপ্টেম্বরে দেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। ১০ এপ্রিল সরকার গঠনের পরে কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। লে. কর্নেল এম. এ. রব সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করে বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দেওয়া হয়। দেশ থেকে বিমান বাহিনীর যেসব বৈমানিক ভারতে আসতে পেরেছিলেন মূলত তাঁদের নিয়েই গঠিত হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। তবে বেসামরিক বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কয়েকজন বৈমানিকও এতে যোগ দিয়ে চূড়ান্ত যুদ্ধে বিমান হামলায় অংশ নিয়েছেন। একইভাবে পাকিস্তানি জাহাজ ও দেশ থেকে পালিয়ে আসা নৌবাহিনীর সদস্যদের নিয়েও গঠিত হয় নৌ কমান্ডো দল। বলা বাহুল্য নদীমাত্রিক সমুদ্রঘেরা দেশের মুক্তির জন্যে পাকিস্তানি নৌবহরে হামলা চালিয়ে সেগুলো অকেজো করে দেওয়ার গুরুত্ব অসীম। ফলে যুদ্ধে যোগ দিতে আগ্রহীদের মধ্য থেকে বাছাই করা তরুণদেরও নৌ কমান্ডো দলে নেওয়া হয়। কঠিন প্রশিক্ষণের পরে তারাই অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর ও দেশের বিভিন্ন নৌবন্দর অকেজো করে দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সরবরাহ লাইন বিঘ্নিত করে তাদের জব্দ করেছিল।

সারা দেশে কিশোর-যুবা-বৃদ্ধ এবং ছাত্র-কৃষক-মজুর, এমনকি নারীদের মধ্যেও দেশের স্বাধীনতার জন্যে জানপ্রাণ দিয়ে যুদ্ধে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এতো তীব্র হয়েছিল যে সেদিন স্বতস্ফূর্তভাবে বহু বাহিনীও গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে মূলত যুবলীগ-ছাত্রলীগের তরুণদের নিয়ে গঠিত বিএলএফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স অন্যতম। ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়নসহ কিছু বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্যরাও গেরিলা বাহিনী গঠন করে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীন পাকিস্তানের পক্ষ গ্রহণ করায় বাংলার চীনপন্থী বাম রাজনৈতিক সংগঠনের অনেকেই চীনের এই অবস্থানের নিন্দা করে এবং মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে চীনপন্থী এই রাজনৈতিক দলের কেউ কেউ চীনের অবস্থানকে সমর্থন করে এবং পাকিস্তানের পক্ষ গ্রহণ করে। এছাড়া সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুঃসাহসী যোদ্ধারা উৎসাহী তরুণদের সংগঠিত করে অনেকগুলো আঞ্চলিক বাহিনী গঠন করেছিল। এসব বাহিনীও সেদিন মুক্তিসংগ্রামে বিপুল অবদান রেখেছিল। অবশেষে নয়মাস পরে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানি বাহিনী যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমরা হানাদারমুক্ত হলাম।

বঙ্গবন্ধুর ভাষায় ওরা আমাদের দাবায়ে রাখতে পারে নি। আমরা বিজয়ী হলাম, স্বাধীন হলাম। বিশ্বের মানচিত্রে লাল-সবুজ পতাকার নতুন রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়াল।

সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ

একটু খেয়াল করে দেখো পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন হত্যা চালিয়েছে তখন কিন্তু ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর, ধর্ম-বর্ণ-জাতি, নারী-পুরুষ এসব বিচার করে নি। তারা বাঙালিদের হত্যা করেছিল। পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতদের যেমন মেরেছে তেমনি নিরক্ষর দরিদ্র রিক্সাচালক বা বস্তিবাসীদেরও গুলি করে হত্যা করেছে। সর্বস্তরের বাঙ্গালিই সেদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল। আবার এদের মধ্য থেকেই তরুণ-তরুণীরা দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

তোমরা একটা কাজ করতে পার। প্রত্যেক পরিবারেই খোঁজ করলে মুক্তিযোদ্ধার খবর পেয়ে যাবে। তাঁদের অভিজ্ঞতাগুলো শুনে লিখে ফেলবে। তারপর স্কুলে এসে পরস্পরের লেখাগুলো শুনে নিতে পার। তাহলেই বুঝতে পারবে সমাজের সব স্তরের সব ধর্মের মানুষ এতে যুক্ত হয়েছিলেন। এমনকি নারীরাও পিছিয়ে থাকেন নি। তোমরা নিশ্চয় তারামন বিবি, কাঁকনবিবি এঁদের নাম শুনেছ।

গেরিলা যুদ্ধ

আরেকটা বিষয়ও খুব গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধে দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যে সনাতন ধারার যুদ্ধ হয়েছে শেষের দিকে। তার আগে আমাদের দিক থেকে মূলত চলেছে গেরিলা যুদ্ধ। গেরিলারা ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হঠাৎ করেই আক্রমণ চালিয়ে আবার ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়। একে বলে ‘হিট অ্যান্ড রান’ পদ্ধতি, অর্থাৎ আক্রমণ করেই পালিয়ে যাও। ফলে গেরিলাদের দেশের ভিতর গোপন আস্তানা দরকার ছিল, গোলাবারুদ রাখার নিরাপদ স্থানের দরকার ছিল, অনেক সময় চলাচলের জন্য নির্ভরযোগ্য মানুষের গাড়ি, নৌকা বা রিকশারও প্রয়োজন হতো। তাই মনে রাখতে হবে অনেক পরিবার এভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। গৃহিণীরা গেরিলাদের খাবার ব্যবস্থা করেছেন, আবার ছোটো ছেলেমেয়েরা খবর আদান-প্রদানে সহায়তা করেছে। ফলে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ না করেও মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন অনেকে। তোমরা হয়ত শহিদ সুরকার আলতাফ মাহমুদের কথা জানো। ইনিই আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি– এই বিখ্যাত গানে সুর দিয়েছিলেন। শহিদ জননী জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলো থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গেরিলা আক্রমণের ঘটনাটাও পড়ে নিতে পার। পাশাপাশি একজন গেরিলা বা এ ধরনের অভিযানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনকারী মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর অভিজ্ঞতা শুনতে পারলে তাও হবে এক বিরাট প্রাপ্তি। চেষ্টা করে দেখতে পার এমন কাউকে খুঁজে পাও কিনা।

এক কোটি শরণার্থী

২৫ মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির আক্রমণের মুখে অনেক মানুষ যেমন নিহত হয়েছেন তেমনি বহু মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আদতে বিজয় পর্যন্ত বছর জুড়ে এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চলেছে। ফলে প্রথম থেকেই দলে দলে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে শুরু করে। সবার লক্ষ্য হয়ে ওঠে আক্রান্ত দেশের সীমানা পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নেওয়া। এভাবে বহু মানুষ সেদিন ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁরাই হলেন একাত্তরের শরণার্থী। বছর শেষে ভারতে এরকম আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এক কোটির মতো। তারা অত্যন্ত কষ্টকর জীবন যাপন করে দেশের স্বাধীনতায় অবদান রেখেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার, ত্রিপুরা রাজ্য সরকার এবং এসব অঞ্চলের মানুষ শরণার্থীদের যেমন সাহায্য করেছেন তেমনি বাড়তি মানুষের চাপও সয়েছেন। ফলে শরণার্থীদের ত্যাগ এবং সহায়তকারীদের অবদান– দুটি বিষয়ই আমাদের মনে রাখতে হবে।

প্রকৃতি ও জলবায়ুর ভূমিকা

আরেকটা বিষয় জানলে ভালো লাগবে। জানোই তো বাংলাদেশ হলো নদীমাতৃক দেশ। এদেশে অনেক নদনদী-খাল আছে। এর বাইরে বিল, ঝিল আর জলাভূমি তো অসংখ্য। সব গাঁয়েই যেন নদী নয়ত খাল রয়েছে, তার ওপরে আছে বর্ষার প্রকোপ। একাত্তরে বর্ষা ছিল অনেকদিন, তাতে বছরের বেশির ভাগ সময় নদী-খাল-বিল ছিল ভরাট, কাদায় পথচলা ছিল কষ্টকর। গেরিলা যুদ্ধের জন্যে এমন ভূপ্রকৃতি আর জলবায়ু খুব উপযোগী। পাকিস্তানিরা কিন্তু গেরিলা যোদ্ধা ছিল না, তারা সনাতন পদ্ধতির সৈনিক। তার ওপর ওদের দেশ হচ্ছে রুক্ষ, শুষ্ক, ওখানে এতো নদী-নালা-খাল-বিল নেই। ওরা জানত না সাঁতার, ফলে পানিতে ওদের খুব ভয়। এই প্রাকৃতিক পরিবেশও আমাদের জন্যে যুদ্ধে খুব সহায়ক হয়েছিল। এদেশীয় দালাল আলবদর রাজাকার আর শান্তি কমিটির মতো বিশ্বাসঘাতকরা না থাকলে ওরা নয়মাসও টিকতে পারত না, অন্তত গ্রামগঞ্জ সবসময় স্বাধীন থাকত।

হানাদারদের দোসর

তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশের মানুষের উপর পাশবিক অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চালানোর প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সত্ত্বেও বাংলার মাটিতে বেড়ে ওঠা কোনা কোনো মানুষ নিজ দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা নিজ দেশের ভাই বোনদের পাকিস্তানীদের হাতে তুলে দেয়। নিজ জন্মভূমির মানুষের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাথে। এরমধ্যে রয়েছে পাকিস্তান সমর্থনকারী তৎকালীন শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন- ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফোরাম (NSF) যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বিরোধী পক্ষ হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়াও আত্মসমর্পণের আগে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী এদেশীয় দোসর আলবদর-রাজাকাররা বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হত্যা করে। আসলে ১৯৭১ এ সারা বছর ধরে তারা মানুষ হত্যা করে গেছে। জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল হানাদার পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়েছিল। এদের নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি– হানাদারদের দালাল ও দোসরের ভূমিকা পালনের জন্যে। এছাড়াও এরা রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গঠন করে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, লেখক শিল্পীদের হত্যার কাজে লাগিয়েছিল। আমরা জানি ৩০ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীন দেশ পেয়েছি। তার সাথে যোগ করতে হবে দুই থেকে তিন লক্ষ নারীকে নির্মমভাবে নির্যাতনের ঘটনা। ফলে এই স্বাধীনতা বহু মানুষের আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে। একদিকে লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগ এবং অন্যদিকে বহু মানুষের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায় আমরা লাভ করেছি লাল-সবুজের এই পতাকা। এই পতাকার সম্মান এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের সবার পবিত্র দায়িত্ব।

যুদ্ধদিনের বাংলাদেশ

একটা কথা মনে রেখো এই যুদ্ধে যেমন সর্বস্তরের মানুষ যোগ দিয়েছিল তেমনি দেশের ৬৪ হাজার গ্রামের কোনোটিই হয়ত বাদ ছিল না এ যুদ্ধ থেকে। পাকিস্তানি হানাদাররা প্রায় প্রত্যেক গ্রামে আগুন দিয়েছে, কোথাও গণহত্যা চালিয়েছে। সারা দেশে কত বধ্যভূমি ছড়িয়ে আছে! ত্রিশ লক্ষ মানুষ হত্যা তো সহজ কাজ নয়। সারা দেশ জুড়ে পুরো নয়মাসব্যাপী এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ চলেছে।

ফলে এরকম পরিবেশে ইদ, পূজা, পার্বণগুলো যথাযথ উৎসবের মতো পালনের মনোভাব মানুষের মধ্যে ছিল না। থাকবেই বা কী করে! বাড়ির সন্তান হয়ত যুদ্ধে গেছে, আবার কোথাও সন্তান খবর পাঠিয়েছে তার দল রাতে খাবে, কোথাও আহত যোদ্ধার সেবার ব্যবস্থা করতে হবে, কাউকে বা অস্ত্রগুলো নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। অনেক বাড়ির এক বা একাধিক সদস্য তো শহিদ হয়েছিলেন। তাদের পক্ষেও শোক কাটিয়ে উৎসব পালন ছিল কঠিন। প্রতি মুহূর্তে ছিল মৃত্যুর ভয়। দেশ তখন ছিল যেন এক মৃত্যুপুরী। যুদ্ধ তো ইদ-পার্বণের দিনেও থেমে থাকে নি। ফলে এ ছিল ভিন্ন রকম ইদ বা পূজা। হ্যাঁ বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের কাছ থেকে একাত্তরের উৎসবের দিনগুলোর কথাও জেনে নিতে পার। সেই বছর একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল যুদ্ধের আগে আগে, তাই খুব উৎসাহের সঙ্গে সেটি পালিত হয়েছিল। কিন্তু নববর্ষ পড়েছিল যুদ্ধের ভিতরে, সেটি সেভাবে পালিত হতে পারে নি। যেসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নববর্ষ উপলক্ষে বৈসাবি, সাংগ্রাই বা অন্য উৎসব পালন করে তাদের কী অবস্থা ছিল তাও জেনে নেওয়া যায়। এর ভিত্তিতে একাত্তরের উৎসব নামে একটা অনুসন্ধানী কাজ তোমরা করতে পার।

একাত্তর সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও ঠিক মতো হতে পারে নি। কোথাও আগেই প্রচারপত্র বিলি করে পরীক্ষা না দিতে বলেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজন, কোথাও পরীক্ষাকেন্দ্রের গেইটে লিখে দিয়েছে সে কথা। আর কোথাও কেন্দ্রের আশেপাশে গ্রেনেড হামলা হয়েছে। এ সময় পাকিস্তানের দখলদারিত্বে দেশের কিছুই যে স্বাভাবিক নেই সেটা প্রমাণ করতে হবে না বিশ্বের কাছে! তাই এই ব্যবস্থা।

শেষ কথা

যুদ্ধের নয়মাস দেশ অবরুদ্ধ ছিল, জীবন ছিল অস্বাভাবিক। মানুষ কেবল আতঙ্কের মধ্যেও স্বাধীনতার প্রহর গুনেছে, তার জন্যে কাজ করেছে।

সিয়ামের দাদার একনাগাড়ে বলা কথাগুলো তিনজনের মাঝেই একটা ঘোর তৈরি করে দিল। মনের মধ্যে হাজার প্রশ্ন টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে সবার। প্রশ্নগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে নাসির আর আয়েশা বাড়ি ফিরে এলো। ওরা ঠিক করল এবার সুন্দর একটা পরিকল্পনা করে কাজে নেমে পড়তে হবে।

অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ

নাসির আয়েশাকে বলল, খুব ভালো একটা কাজ হলো। দাদা আর খুশি আপার সহযোগিতায় আমরা বই আর পত্র-পত্রিকা থেকেও প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পেলাম। এবার চলো আমরা আমাদের পরিবার ও এলাকার যেসব বয়স্ক ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানেন তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি।

মালা বলল, সে না হয় করব কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করবটা কী? আয়েশা বলল, ভালো কথা বলেছ। তাহলে চলো আমরা একটা সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন	সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা
১। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর কীরকম অত্যাচার হয়েছিল?	১। মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন? ২। তখন আপনার বয়স কত ছিল? ৩। আপনার জানা মতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কি এই এলাকায় এসেছিল? ৪। উত্তর হ্যাঁ হলে, তারা কী ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন করেছিল? (উপরের নমুনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় আরও প্রশ্ন তৈরি করে নিতে পারে।) ৫।_______ ৬।_______ ৭।_______
২। মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল?	উপরের নমুনা প্রশ্নের মতো শিক্ষার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করে নিতে পারে। ১। ২। ৩। ______________________________
৩। সাধারণ মানুষ কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল?	উপরের নমুনা প্রশ্নের মতো শিক্ষার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করে নিতে পারে। ১। ২। ৩। ______________________________
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: তারিখ:	

চলো নাসির ও আয়েশা আর তার বন্ধুদের মতো আমরাও আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করি এবং তথ্য সংগ্রহ করি।

এরপর নাসির, আয়েশা আর তাদের বন্ধুরা দলে ভাগ হয়ে প্রথমে নিজ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করল। দলের সব সদস্য তাদের প্রাপ্ত তথ্য একত্র করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করল। তারা এগুলো নিয়ে খুশি আপার সাথে আলোচনা করল। এরপর খুশি আপা প্রতিটি দলকে বললেন, দলের সদস্যদের স্বজনদের ঘটনা থেকে অন্তত একটি বিশেষ ঘটনা ক্লাসের সবার সাথে শেয়ার করতে।

- প্রতি দলের উপস্থাপনার পর খুশি আপা তাদের সংগৃহীত ঘটনাবলীতে যেসব জায়গার উল্লেখ পাওয়া গেছে সেখান থেকে নতুন তথ্য পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করতে বললেন। এই প্রসঙ্গে এলাকার প্রকৃতি ও পরিবেশগত কারণে (যেমন- নদী নালা বেশি থাকার কারণে) পাকিস্তানিরা কোনো বাধা পেয়েছে কিনা সেই তথ্যও অনুসন্ধান করতে বললেন। দলগুলো জায়গাগুলো খুঁজে বের করল এবং দলগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই জায়গা পরিদর্শন করে, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে কিংবা বয়স্ক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করল। কাজে যাবার আগে দলগুলো শিক্ষকের সাথে দলগত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করল।

- দলগুলোর কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুচ্ছে কি না খুশি আপা তার খোঁজখবর নিলেন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিলেন। তবে কোনো মতামত চাপিয়ে না দিয়ে তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন এবং প্রয়োজনে কারিগরি (যেমন- তথ্য সংগ্রহের জন্য রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি) ও প্রশাসনিক (যেমন- কোনো জায়গায় প্রবেশ করতে বিশেষ অনুমতি দরকার হলে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শক্রমে চিঠি দেওয়া) সহায়তা দিলেন।

- দলগুলো নিজ নিজ এলাকায়/লোকালয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা/ঘটনা/উল্লেখযোগ্য স্থান/ সমাজের একক ব্যক্তি/পরিবার/দলগতভাবে মানুষের অবদান সম্পর্কে বয়স্ক বা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করল। সে সময় স্থানীয় জনগণের বাস্তব অবস্থা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং এর সাথে মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক, তখনকার অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ সম্পর্কে তারা খোঁজখবর নিল। এছাড়া বিভিন্ন উৎসব উদযাপন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাঝে আন্তঃসম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধের স্থল ও ঘটনাবলি বা প্রত্যক্ষদর্শী সম্পর্কে জানার চেষ্টা করল এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দলের সদস্যরা নোট করে নিল। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তারা বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ব্যবহার করে এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সম্বলিত স্থানসমূহ চিহ্নিত করে মানচিত্র তৈরি করল।

চলো আমরাও আমাদের কাজের একটি মানচিত্র তৈরি করি

দলের প্রত্যেক সদস্যই পর্যায়ক্রমে যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, অবদান রাখতে পারে খুশি আপা সে বিষয়টি নিশ্চিত করলেন।

তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ

- খুশি আপা বারবার দলগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যে সঠিকতা তা কীভাবে যাচাই করবে তার ধারণা নিলেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। তবে দলগুলোর উপর কোনো মতামত চাপিয়ে দিলেন না।

- সবাই দলগতভাবে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জন করে বিশ্লেষণ করল এবং নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতাসমূহ শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে উপস্থাপন করল।

ফলাফল তৈরি ও উপস্থাপন

- এই পর্যায়ে খুশি আপা জানতে চাইলেন, এই কাজের মধ্য দিয়ে তোমরা মুক্তিযুদ্ধের যেসব ঘটনা খুঁজে এনেছ সেগুলো কীভাবে অন্যদের জানাতে পার?

- সবাই দলে আলোচনা করে বিভিন্ন সৃজনশীল ও অভিনব উপায় পরিকল্পনা করল। যেমন- ফটোবুক, প্রামান্য চিত্র, দেয়ালিকা, পোস্টার, লিফলেট, ফটোগ্রাফি বা আঁকা ছবি প্রদর্শনী, বই তৈরি, নাটক মঞ্চায়ন ইত্যাদি। খুশি আপা এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তাদের পরিকল্পনা করতে দিলেন, শুধু সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সচেতন করলেন। খুশি আপার পরামর্শ নিয়ে দলগুলো তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করল এবং কোনো জাতীয় দিবসে তা অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের দেখাল ও তাদের মতামত গ্রহণ করল।

- এবার খুশি আপা বললেন, বিদ্যালয়ে উদযাপিত যেকোনো জাতীয় দিবস যেমন, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৪ই এপ্রিল বা ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্রভৃতি জাতীয় দিবসের সাথে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের সামনেও তোমাদের প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করতে পার। আমরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব।

- সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মতামত অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিভাবক, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি/মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত থাকলেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ

এরপর খুশি আপা মুক্তিযুদ্ধের এসব স্মৃতি ধরে রাখার স্থায়ী কোনো উপায় করা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। বললেন যে, প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিফলন হিসেবে তোমরা নিজ নিজ এলাকায় “শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ”, বিদ্যমান স্মৃতিস্তম্ভ/সৌধ আধুনিকায়ন/সংরক্ষণ বা পুনঃনির্মাণের নকশা তৈরির পরিকল্পনা বা প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে পার এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের (উপজেলা বা জেলা) সহযোগিতার আবেদন করতে পার।

এবার চলো আমরা অধ্যায়ের শেষে সংযুক্ত সতীর্থ মূল্যায়নের ছক ব্যবহার করে দলের সবাই সবার মূল্যায়ন করি।

ডকুমেন্টেশন

সবশেষে দলগুলো দলগত কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ, আত্ম-প্রতিফলনের লিখিতরূপ এবং অর্জিত শিখনের সারসংক্ষেপ (ছবি/ভিডিও/লিখিতরূপ/ খসড়া এর হার্ড বা সফট কপি) খুশি আপার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করল।

শিক্ষার্থী কর্তৃক দলের সদস্যদের পারদর্শিতা মূল্যায়ন

দল নং-

শিরোনাম	
শ্রেণি: বিষয়:	সময়সীমা:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	ক	খ	গ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
আগ্রহ	কাজ করতে খুবই আগ্রহী। দলের অন্য সদস্যদেরকেও আগ্রহী করতে চেষ্টা করে। দলে নিজের ভূমিকা পালন করে	কাজে খুব একটা আগ্রহী না হলেও নিজের অংশের কাজটুকু মোটামুটি করে রাখে।	কাজে আগ্রহ তৈরি করা প্রয়োজন। অন্যদের সাথে মিলে আরও কাজ করতে হবে।										
দলগত পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ	দলের সিদ্ধান্ত ও কাজের পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী নিজের কাজগুলো ঠিকঠাকভাবে পালন করে।	দলের সিদ্ধান্ত ও কাজে সক্রিয় অংশ নেয় না পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় না, কাজ একাই করে, দলের অন্যদের সাথে মিলেমিশে নয়।	দলের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য বন্ধুটিকে আমরা আরও সাহায্য করব।										
সময় ব্যবস্থাপনা	সময় ঠিক রেখে কাজ করে, সময়মত নিজের কাজ জমা দেয়।	মাঝে মাঝে সময়সীমা মেনে কাজ করে। সবসময় নয়	বন্ধুটি সময় মেনে কাজ জমা দিতে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।										

গণতন্ত্র চর্চা	নিজের বক্তব্য, মতামত, স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করে এবং অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করে অথবা দলগত আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলে	দলের মিটিং এ মতামত দেওয়ার অথবা অন্যদের কথা বলার সুযোগ দেওয়ার অনুশীলন প্রয়োজন										
যৌক্তিক অবস্থান	যুক্তি দিয়ে নিজের মতামত দেয়, নিজের ভুল দলের অন্য কেউ দেখিয়ে দিলে সাথে সাথেই শুধরে নেয়। দলের অন্যদের তর্কবিতর্ক হলে তা সমাধানের চেষ্টা করে	তর্কে বা যুক্তিতে হেরে গেলে মেনে নেয়, কিন্তু ভালভাবে নিতে পারে না। অথবা যুক্তিতে হেরে গেলেও অনেক সময় তর্ক চালিয়ে যেতে চায়।	অন্যের যৌক্তিক মতামতকে শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিতে, নিজের ভুল স্বীকার করতে আরও চর্চার প্রয়োজন										
পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করে এবং অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করে	অন্যদের মতামতে ভিন্নতা থাকলে তা মেনে নিলেও সেই অনুযায়ী নিজের অবস্থান পাল্টাতে চায় না।	ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোতে আরও চর্চার প্রয়োজন। অন্যের ভিন্নমত থাকলে তাকে এড়িয়ে যায় কিংবা আক্রমণাত্মকভাবে তর্ক করে										

ফিডব্যাক প্রদান	অন্যদের কাজে সাহায্য করে ও কার্যকর, বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দেয়। অন্যের কাজে ভালো দিক, দুর্বল দিক যেমন শনাক্ত করে তেমনি কাজের উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দেয়।	শুধুমাত্র অন্যের কাজের দুর্বল দিক শনাক্ত করে। উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দিতে পারছে না।	অন্যের কাজের জন্য কার্যকর দিকনির্দেশনা/ ফিডব্যাক দেওয়ার চর্চা প্রয়োজন										
ফিডব্যাক গ্রহণ	অন্যদের শনাক্ত করে ভুল থেকে শিক্ষা নেয় ও আরও ভাল করার চেষ্টা করে	সমালোচনা বা ফিডব্যাক গ্রহণ করে, কিন্তু সে অনুযায়ী কাজের উন্নয়ন করতে পারে না।	অন্যের দেওয়া ফিডব্যাককে সহজভাবে নিয়ে সে অনুযায়ী নিজের কাজের উন্নয়নের চর্চা করতে হবে।										

দলের সকল শিক্ষার্থীর ক্রমানুযায়ী নাম, রোল ও স্বাক্ষর:

ক্রম	নাম	রোল	স্বাক্ষর
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			

শিক্ষকের নাম:

স্বাক্ষর ও তারিখ:

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায়

বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয়

নীলান্ত বসেছে জানালার পাশের একটা সিটে। জানালা দিয়ে সে মুক্ত আকাশে এক ঝাঁক পাখির বাধাহীন উড়ে চলা দেখছে। মেঘলা ওর পাশে এসে বসলো। নীলান্ত ফিরেও তাকাল না।

মেঘলা জানতে চাইল, কী রে, কী দেখছিস?

নীলান্ত চমকে উঠে ফিরে তাকায়। আনমনে উত্তর দিলো, খোলা আকাশ, মেঘের দেশ আর পাখিদের উড়াউড়ি দেখছি আর ভাবছি গতরাতে দাদুর মুখে শোনা ডালিমকুমারের গল্প।

মেঘলা বলে, ডালিমকুমারের গল্প আমিও শুনেছি বহুবার। রাজার ছেলে ডালিমকুমার। বিশাল তাদের রাজ্য। হাতিশালায় হাতি, ঘোড়াশালায় ঘোড়া। এতো এতো সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে যায়। বন্দি এক রাজকন্যাকে রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করে।

নীলান্ত তখনো ভাবনার জগতে বিচরণ করছে। মেঘলার কাছে সে জানতে চাইল, আগের দিনে সত্যিই কি এমন রাজা ছিল? রাজ্য এবং রাজকুমার ছিল? এখনও কি আছে? ডালিমকুমারের গল্প কি সত্যি?

পেছন থেকে ওদের আরেক বন্ধু তানহা চাকমা হেসে উঠে বলল, তুই কি রাজকুমার হতে চাস নীলান্ত?

নীলান্ত বলে উঠে, না। সে বলে, অনেক আগে আমাদের এই দেশ কি রাজারা চালাতেন? সেই রাজারা কেমন মানুষ ছিলেন? এতো এতো হাতি আর ঘোড়া নিয়ে সত্যি সত্যি তারা যুদ্ধ করতেন? তাদের রাজ্যে সাধারণ প্রজারাই বা কেমন ছিলেন? সত্যিই কি তারা ছিলেন, নাকি আমরা যেসব গল্প শুনি তা সবই মানুষের মনগড়া কিংবা রূপকথা?

ওদের কথা শুনে ক্লাসের অনেকেই বেশ আগ্রহ নিয়ে ফিরে তাকায়। তারাও প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার উপায় নিয়ে ভাবছে। খুশি আপা ক্লাসে আসার পর নীলান্ত সবার আগে উঠে দাঁড়িয়ে এক এক করে প্রশ্নগুলো করল।

চলো, এইসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করি। আসলে মানুষের মুখে মুখে এমন অনেক গল্প ছড়িয়ে থাকে যার কিছুটা হয়ত সত্য, আর কিছুটা হয়ত একেবারেই কাল্পনিক। তবে তোমরা যদি সত্যিই জানতে চাও মানুষের অতীতকালের কথা, তাহলে ইতিহাস পড়তে হবে। মনে রাখবে, ইতিহাস আর রূপকথা কিন্তু এক নয়। রূপকথা হচ্ছে মানুষের মনগড়া কল্পকাহিনি। আর ইতিহাস হচ্ছে অতীতে মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা। মানুষের নানান কাজকর্ম বা জীবনধারার ধারাবাহিক বর্ণনা যখন আমরা নির্ভরযোগ্য উৎস ও প্রমাণের আলোকে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানার চেষ্টা করি তখনই তা ইতিহাস হয়ে ওঠে। আর একটি কথা। ইতিহাস কেবল রাজকুমার, রাজা বা রাজ্যের বর্ণনা নয়। মানুষ লক্ষ বছর ধরে কীভাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদের অস্তিত্ব

টিকিয়ে রেখেছে, কৃষি ও নগর বিপ্লব ঘটিয়েছে, ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম উদ্ভাবন করেছে, রাজ্য-রাষ্ট্র নির্মাণ করে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে তা ইতিহাস পড়েই জানা যায়। জানা যায়, আদিযুগে মানুষ কেমন ছিল, কীভাবে তারা বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে জীব-জন্তু শিকার করত, নানান প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে ছোটো ছোটো দল থেকে আস্তে আস্তে কীভাবে তারা গোত্র বা কৌম গড়ে তুলেছিল। তারপর কীভাবে তারা একটার পর একটা যুগ অতিবাহিত করেছে, প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের উন্নতি করেছে, সভ্যতা নির্মাণ করেছে, এক পর্যায়ে গঠন করেছে স্বাধীন দেশ- এই সব তথ্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে লেখা ইতিহাস পাঠ থেকে জানা যায়।

খাদ্য সংগ্রহ থেকে উৎপাদন: আধিপত্য বিস্তারের সূচনা

আজ থেকে আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশ অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলে মানুষের বেঁচে থাকার প্রধানতম সংগ্রামই ছিল খাদ্য সংগ্রহ করা। এরপর কৃষি ও চাষাবাদের কৌশল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো খাদ্য উৎপাদনের সংগ্রাম। মানুষের জীবন গেল বদলে। আনুমানিক সাত হাজার বছর পূর্বে মানুষ কৃষি আবিষ্কার করে। বাংলা অঞ্চলে খাদ্য সংগ্রহ, শিকার ও উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষকে বিষাক্ত সাপ ও পোকার কামড় এবং বন্য জীব-জন্তুর আক্রমণ মোকাবেলা করতে হতো। তারপরেও কৃষিকাজ বা চাষাবাদ শুরু করা ছিল ভারতবর্ষের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনে প্রথম যুগান্তকারী ঘটনা। ইতিহাসের আলোচনায় এই সময়টাকে তাই 'কৃষি বিপ্লব'– এর সময় বলে অভিহিত করা হয়।

বাংলা অঞ্চলে খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তা মজুদ করাও শিখে যায়। মানুষ যখন খাদ্য মজুদ করে রাখা শুরু করে, তখন গোত্রে ও সমাজে খাদ্য বণ্টন নিয়ে দেখা দিতে শুরু করে বৈষম্য। এই বৈষম্য মানুষের টিকে থাকার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। যে গোত্র যতো বেশি খাদ্য/সম্পদ মজুদ করতে থাকে, মানুষের উপর তাদের ততো বেশি ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তার করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। খাদ্য মজুদ করেই একশ্রেণির মানুষ 'সম্পদশালী' হয়ে ওঠে এবং অপরাপর সাধারণ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে।

এরপর বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে আসে নগর বিপ্লব। এই সময় থেকে মানুষ অক্ষরের আবিষ্কার ও ব্যবহার করতে শুরু করে। মানুষের কাজকর্মের লিখিত দলিল তৈরি হয়। এই সময় থেকেই ইতিহাসে নগর সভ্যতার সূচনা হয়েছিল বলে ইতিহাসবিদগণ বলে থাকেন। নগরগুলোতে রাজা, রাজ পরিবার এবং সংখ্যায় অল্প একটি শ্রেণির সৃষ্টি হয় যাঁরা সেই সময়ের সম্পদ, শক্তি ও ক্ষমতাসহ সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। সাধারণ মানুষেরা ছিলেন সবদিক থেকেই বঞ্চিত।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়: দূরবর্তী সংযোগ

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠা নগর সভ্যতা যেমন- হরপ্পা সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতার কথা আমরা জেনেছি। একই সঙ্গে জেনেছি পান্ডুরাজার ঢিবি, পুণ্ড্রনগর, তাম্রলিপ্তির কথাও। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা মানববসতির বিভিন্ন ধরন বা বৈচিত্র্যের কথা তোমরা বড়ো হয়ে আরও বিস্তারিত পরিসরে জানতে পারবে। আজকে চলো, আমাদের মূল আলাপ শুরু করি। ইতিহাসের হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব অংশে অবস্থিত বাংলা অঞ্চলের পূর্ব প্রান্তে ১৯৭১ সালে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

ঘটেছিল তা অনুধাবনের চেষ্টা করি। একই সঙ্গে এই অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখেছিল তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করি। এই আলোচনায় বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের দূরবর্তী ঘটনাগুলো কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত তাও অনুসন্ধান করে দেখার চেষ্টা করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ১৩০০ সাল পর্যন্ত, সপ্তম শ্রেণিতে ১৮০০ সাল এবং অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে আমরা অনুসন্ধান করে দেখব।

বিরল ভূ-বৈচিত্র্য: বাংলা অঞ্চলের মানুষের পরিচয় গঠনে বাঁধা নাকি সুবিধা?

ইতিহাসের আদিকাল থেকেই বাংলা অঞ্চলের ভূমি ছিল উর্বর। নদীতে ছিল প্রচুর মাছ। বনে-জঙ্গলে ছিল নানান ফলমূল। আবার মানুষের জন্যে এখানে বেশ বিপদও ছিল। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে সব সময় ঝড়-তুফান হয়। এইসব প্রতিকূলতার মধ্যেই টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে বাংলা অঞ্চলের মানুষকে। বাংলার যেইসব স্থানে প্রাচীন মানুষের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে সেগুলো সবই দেখবে আশেপাশের এলাকা থেকে একটুখানি উঁচুভূমি হিসেবে চিহ্নিত। প্রাচীনকালে বাংলার নদীগুলো ছিল অনেক বেশি প্রমত্তা। বাংলা অঞ্চলে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নদী যেমন ছিল, তেমনই ছিল ঘন বন-জঙ্গল। মানুষ তাই নদীর তীর ঘেঁষে বনের সীমানা ধরে উঁচু ভূমিগুলোকে বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

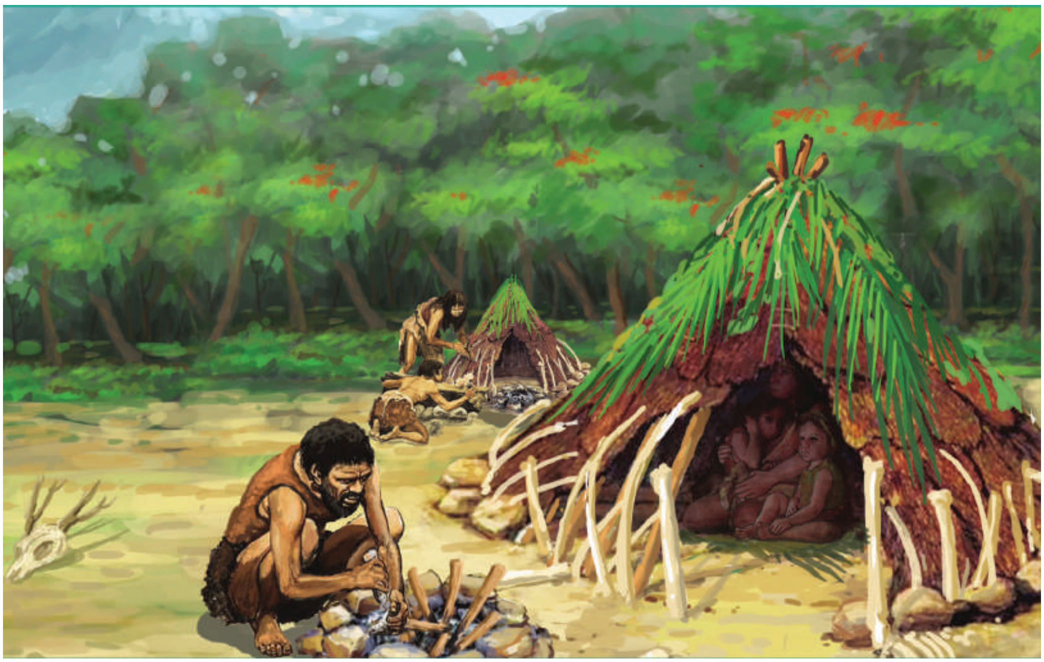

আদিম মানুষের আগুনের ব্যবহার

আদিম মানুষের গোত্রবদ্ধ জীবনের ছবি। ঐতিহাসিক কালপর্বে প্রবেশের পূর্বসময় পর্যন্ত আগুন ছিল মানুষের অন্যতম প্রধান অস্ত্র ও আশ্রয়। আগুন এবং পাথর নেড়েচেড়ে মানুষ পৃথিবীর বুকে তাঁর অস্তিত্বের সবচাইতে দীর্ঘ সময় অতিক্রম করেছে।

নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগর আর নদীতে নৌকা। প্রাচীন পুণ্ড্রনগরকে কল্পনা করে আঁকা

(সূত্র: সুজা-উদ-দৌলার চিত্রের রূপান্তর)

বঙ্গ নাম-পরিচয়ের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল ‘বঙ্গ’ জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশালের বৃহত্তর অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই জনপদ। ৬ষ্ঠ শতকের দিকে এই জনপদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বঙ্গ নামে একটি স্বাধীন ‘রাজ্য’। পশ্চিমে এর সীমানা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে কখনো কখনো। তৎকালীন বঙ্গের রাজধানীকে বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায়। বঙ্গের পূর্বদিকে ছিল আরেকটি প্রাচীন জনপদ ‘সমতট’। জনপদটি গড়ে উঠেছিল বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা-নোয়াখালীসহ সংলগ্ন এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান অংশ নিয়ে। ছোটো ছোটো এই জনপদগুলোই ছিল বাংলা অঞ্চলের প্রথম রাজনৈতিক একক বা ইউনিট।

মানচিত্র: প্রাচীন যুগের বাংলা অঞ্চল। এই অঞ্চলের পূর্ব অংশে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর জন্ম হয়।

উপরের মানচিত্রে বাংলা অঞ্চলের জনপদ ও প্রধান নদীগুলো চিহ্নিত করা হলো

বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোতে যারা বাস করতেন তারা ছিলেন প্রধানত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের পাশাপাশি ছিলেন দ্রাবিড়, চৈনিক, তিব্বতি-বর্মি ভাষায় কথা বলা আরও দু/তিনটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠী এবং তাদের অসংখ্য ধারা-উপধারা। এরা হাজার বছর ধরে যার যার ভাষা, লোকজ ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে নিজের মতোই জনপদ গড়ে তুলে বসবাস করছিলেন। আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন, বাংলা অঞ্চলের (বর্তমান বাংলাদেশ এবং

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অন্যান্য অংশ) বহু স্থানে এখনো কোল, ভিল, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ, নিষাদ নামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। এঁদের প্রত্যেকের ভাষাই অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত। এছাড়াও চাকমা, মার্মা, মুরং, গারো, খাসিয়াসহ আরও অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাংলা ভূখণ্ডের সীমানার মধ্যে কিংবা আশে-পাশে বসতি গড়ে তুলেছিল এবং এখনো বসবাস করছে। এদের বেশিরভাগই চৈনিক, বর্মি, তিব্বতি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এবার প্রশ্ন জাগতে পারে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা এখন তাহলে এতো কম কেন? এইসব জনগোষ্ঠীর বাইরে যে বাংলা ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষ রয়েছে তারা কারা? কী তাদের পরিচয়?

বাংলা অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ৩০ কোটির উপরে মানুষ বসবাস করছে। এর মধ্যে কেবল বাংলাদেশে রয়েছে ১৭ কোটির মতো মানুষ। এই মানুষের বেশিরভাগ বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি। হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা ভূখণ্ডে প্রবেশকারী নানান গড়ন ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ মিলে-মিশে বাঙালি জনগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। এই জনগোষ্ঠীর বয়স কয়েক হাজার বছর। কিন্তু ভাষা গঠন প্রক্রিয়ার বিচারে বাংলা ভাষার বয়স মোটামুটিভাবে দেড় হাজার বছর।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভাগ্য অনুসন্ধানে, খাবারের প্রয়োজনে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে আঞ্চলিক বাংলায় নানান ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জনধারার মানুষের আগমন ঘটেছে। এদের অনেকেই বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করেছে। জল-জঙ্গলের প্রতিকূলতা জয় করে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকার যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলা অঞ্চলের সকল মানুষ ভিন্নতর অভিজ্ঞতা নিয়ে এই ভূখণ্ডে ইতিহাস রচনা করেছেন। এই ইতিহাসে তাই ভৌগোলিক বিষয়াবলির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা আমরা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের শুরুর দিকের পাঠ অনুসন্ধান করে জেনেছি এবং শিখেছি।

রাজা, রাজ্য, রাজনীতি এবং মানুষের মুক্তি সংগ্রাম

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রাচীন ইতিহাসে বিভিন্নভাবে রাজা আর রাজ্যের দেখা পাওয়া যায়। আমাদের বাংলা অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম নয়। এই বাংলায় যেমন মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, খলজি, হোসেন শাহ, মুগল বংশের শাসক ছিলেন, তেমনি ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীও শাসন করেছে এই অঞ্চল। তারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে বাংলা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। এভাবে নতুন নতুন রাজশক্তি, জনধারা, নতুন নতুন ভাষা ও ধর্ম-সংস্কৃতির মানুষ এসে বাংলা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি বাংলা অঞ্চলের কাদা-মাটি, নদী-নালা, বিল, হাওর-বাঁওড়, বৃষ্টি আর সবুজের ভেতর দিয়ে উঠে এসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পূর্বে বাংলার ইতিহাসে এই ভূ-খণ্ড থেকে উঠে আসা আর কোনো নেতা একাধারে সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, সকল ধর্মের সকল মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে কাজ করেন নি।

বঙ্গ, পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সমতট ইত্যাদির সীমানা কখনই একরকম ছিল না। রাজাদের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমানারও বদল হয়েছে। এই অবস্থা চলেছে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যখন প্রথমবার বঙ্গভঙ্গ বা বাঙলা ভাগ এবং ১৯১১ সালে সেই ভাগ রদ করে আবারো বাঙলা প্রদেশ গড়ে তোলা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় বাংলা-কেও দ্বিতীয়বার ভাগ করা হয়। দুই ভাগের একভাগ প্রথমে পূর্ব বাংলা এবং পরে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা প্রদান করে। যা সাধারণ মানুষের মনে তীব্রভাবে আঘাত হানে। ১৯৫২ সালে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার মানুষ প্রতিষ্ঠিত

করে তাদের বাংলা ভাষা বলার অধিকার। এভাবে পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ প্রতিবাদ জানায়। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ এর নয় মাসব্যাপী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে একটি ভূখণ্ড। আর এই স্বাধীন বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ড অর্জনে নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জেনেছি আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ নামক অধ্যায়ে।

অনুশীলন: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দলগত উপস্থাপনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য জেনেছি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তাঁর অবদান নিয়ে চলো দলগত উপস্থাপনার আয়োজন করি। এই উপস্থাপনায় আলোচনার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর যেকোনো ছবি, পোস্টার এবং সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর অবদান উপলব্ধি করা যায় এমন যেকোনো কিছু প্রদর্শন করা যাবে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই দলগত উপস্থাপনায় 'আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ' নামক অধ্যায় থেকে এবং ইন্টারনেটে mujib100.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে তোমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পার।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথে নানান ধর্ম-সংস্কৃতি ও রাজনীতির আগমন, রূপান্তর ও বোঝাপড়া

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে নানান ধর্ম-সংস্কৃতি ও রাজনীতির মানুষের আগমন, বসতি স্থাপন ও তাদের মধ্যে বোঝাপড়ার ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মমতাজুর রহমান তরফদারের গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রাচীন বাংলায় দেব, চন্দ্র, পাল আর সেন বংশের শাসনকালে সনাতনি ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম আর লোকধর্মের অনুসারী মানুষেরা বসবাস করতেন। বিশেষ করে পাল বংশ প্রায় চারশো বছর বাংলা অঞ্চলের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশ ও বিহারের বেশ কিছু অংশে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। এই সময় বাংলা অঞ্চলে অনেকগুলো শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে বলা হতো বিহার। বিহারে প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মসহ অন্যান্য শাস্ত্র শেখানো হতো। বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির নানান ধারা এবং উপধারাকে বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন।

পালদের পর একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের দাক্ষিণাত্য থেকে আসা সেন রাজারা বাংলা অঞ্চলের একটি বড়ো অংশ নিজেদের অধীনে নিয়ে নেন। প্রাচীনকালে বিজয়সেন-ই প্রথম রাজা যিনি ১২ শতকে বাংলার গোটা অঞ্চলকে একত্রিত করে শাসন করেছিলেন বলে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ দাবি করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড বাংলার গোটা ভূখণ্ড কখনোই কোনো শাসক এককভাবে শাসন করতে পেরেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সেনদের সময়ে আরব বণিকদের মাধ্যমে পির, সুফি, ফকির, দরবেশদের সঙ্গে বাংলার উপকূলীয় এলাকার সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ১০০০ থেকে ১৩০০ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং বাণিজ্য সূত্রে সাংস্কৃতিক যাতায়াতের খবর ইতিহাসের নানান সূত্র থেকে জানা যায়।

১২০০ সালের পর থেকে বখতিয়ার খলজি নামে একজন ভাগ্যান্বেষী তুর্কি-আফগান বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার প্রদেশের একাংশে রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি রাজ্য বিস্তারের জন্য সেন রাজ্যে এসে উপস্থিত হলে রাজা লক্ষণসেন বিক্রমপুরে (বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলা) অবস্থিত রাজধানীতে ফিরে আসেন বলে জানা যায়। লক্ষণসেন আরো কিছুকাল বাংলার পূর্বাংশে শাসন ক্ষমতা পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন। ১২২০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সেনবংশের ক্ষমতা অব্যাহত ছিল। সেনদের পর বিক্রমপুর সহ বাংলার পূর্বাংশে দনুজ রায় নামে একজন শক্তিশালী রাজার উত্থান ঘটেছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

বখতিয়ার খলজি খুব সম্ভবত রাজধানী স্থাপন করেছিলেন লক্ষণাবতীতে যা পরে লখনৌতি (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহ) নামে পরিচিত হয়। খলজি রাজারা ছিলেন ইসলাম ধর্মের অনুসারী। কিন্তু বাঙলা অঞ্চলের মানুষ তখন ছিলেন সনাতনি ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম আর লোকধর্মের অনুসারী। ধীরে ধীরে পির, সুফি, দরবেশ ও শাসকদের প্রচারে ইসলাম বাংলার বিভিন্ন অংশে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত পরিচিতি লাভ করে।

প্রাকৃতিক সীমানা বিধৃত আঞ্চলিক বাংলায় ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা এবং নানান বৈচিত্র্যময় ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও এখানকার সকল মানুষ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক আশ্চর্য বন্ধনে আবদ্ধ। ধর্মের চেয়ে মানুষ পরিচয় সব সময়ই এখানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

কেবল রাজা-বাদশাদের ইতিহাস পাঠ করে এই ভূমির মানুষকে তুমি মোটেই জানতে ও বুঝতে পারবে না। মানুষকে জানতে হলে মানুষের সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি- সবই জানতে হবে। তোমরা দেখবে, বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান হচ্ছে। ভারতবর্ষের পূর্বাংশ তথা বাংলার বিভিন্ন অংশের ছোটো-বড়ো শাসকদের সাথে চলছে উত্তরাংশের শক্তিশালী শাসকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। আঞ্চলিক বাংলার একেকটি অংশে আলাদা আলাদা রাজবংশ শাসন করছে। এইভাবেই যুগে যুগে নানান প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বাংলা অঞ্চলে সাধারণ মানুষকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছে।

পলাশী থেকে বাংলা ভাগ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পথে

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই শুনেছো। এই যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার একাংশের রাজ ক্ষমতা নিয়ে নেয়। বাণিজ্য করার জন্য যাদের আগমন তারাই একশো বছর বাংলা সহ ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত ভূখন্ড শাসন করেছে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানিকে সরিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ রাজের অধীনে নেয়া হয় বাংলার শাসন ক্ষমতা। ব্রিটিশ শক্তি প্রায় দুইশো বছর বাংলা অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পূর্বে যারা ভারতের পূর্বাংশ তথা আঞ্চলিক বাংলায় এসেছিলেন তাদের অধিকাংশই এখানে বসতি স্থাপন করে স্থানীয় মানুষের সাথে মিশে যান। মানুষের জীবনাচারে এর প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে। ইংরেজরা এখানে এসে স্থায়ী হবার পরিবর্তে এই ভূমির সম্পদ ভোগ-দখলে বেশি মনোযোগী হয়েছে। বেশি বেশি রাজস্ব আদায়, জোর করে সাধারণ মানুষকে দিয়ে জমিতে নীল চাষ করিয়েছে। এর ফলে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ হয় এবং বিদ্রোহ করতে শুরু করে। এইসব বিদ্রোহ

এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে এক সময় ব্রিটিশ শক্তি উপমহাদেশ ও বাংলা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

ইংরেজরা ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ করে ফেরত চলে যান। এসময় বাংলাও ভাগ করা হয়। বাংলা অঞ্চলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের একসাথে মিলে-মিশে বসবাসের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতিহাসের সাথে সংগতিবিহীনভাবে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের নাম করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। বাংলা ভূখণ্ডের আদিকালীন নাম 'বঙ্গ' হারিয়ে যায়। পূর্ব বাংলা এবার পাকিস্তান রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্টীর একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। ভাষা থেকে শুরু করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি আর রাজনীতির সকল ক্ষেত্রেই শোষন ও বৈষম্যের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার মানুষকে এই শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে নামেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর আন্দোলনে পাশে পান বাংলার কৃষক-শ্রমিক-শিক্ষার্থী, ধনী-গরীব সকল মানুষকে। বাংলা ও বাঙালির প্রতি আস্থা আর ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।

এভাবেই হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় ভারতবর্ষের পূর্বাংশে নির্দিষ্ট একটি ভূখন্ড যা কিনা বাংলা অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল সেখানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং নানান ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। 'আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ' এ আমরা বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং এ যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অবদান সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি।

বই পড়া কর্মসূচি

খুশি আপা ক্লাসে ঢুকেই বললেন, কি সবাই প্রস্তুত? আমরা তো ইতোমধ্যে সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন করেছি। আমরা সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে সারা বছরের জন্য বই পড়ার নিয়মাবলি এবং একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করি। প্রথম দিনেই তারা বই পড়া কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুশি আপাকে সাথে নিয়ে লাইব্রেরিতে গেল। সেখানে গিয়ে তারা লাইব্রেরির সদস্য হলো। যাতে সবাই লাইব্রেরি থেকে নিজের পছন্দ মত বই ধার করে পড়তে পারে। তারপর পুরো ক্লাসের সময় জুড়ে তারা লাইব্রেরিতে বসে মনের আনন্দে বই পড়ল।

এই কর্মসূচির ফলাফল হলো অভূতপূর্ব। ক্লাসের সবাই এখন প্রতিদিন মনের আনন্দে বই পড়ে আর সীমাহীন আনন্দের জগতে ঘুরে বেড়ায়।

মূল্যায়ন

এবার চলো আমরা নিচে যুক্ত আত্মমূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে আমাদের বই পড়া কর্মসূচির মূল্যায়ন করি

ক্রম	বই পড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পর	সম্পূর্ণ একমত	মোটামুটি একমত	একমত নই
১।	আমি অন্তত ৩টি বই পড়েছি			
২।	বই পড়ার আগ্রহ আমার বাড়ছে			
৩।	বই পড়ে আমি যা জানতে পাড়ি তা অন্যদের সাথে আলোচনা করি			
৪।	ভবিষ্যতে কী কী বই পড়ব তার একটি তালিকা আমার আছে			
৫।	আমি অন্যদের বই পড়তে উৎসাহিত করি			
৬।	বই পড়তে আমার খুবই আনন্দ হয়			
৭।	বই পড়ে আমি অনেক নতুন নতুন বিষয় জানতে পেরেছি			
৮।	আমি বিশ্বাস করি আমার কাজে ক্লাব উপকৃত হয়েছে			

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মূল্যায়ন

আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাব কার্যক্রম কেমন চলছে?

বছর শেষে নিচের ছক ব্যবহার করে শিক্ষকের সহায়তায় আমরা আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের কার্যক্রম ও এ থেকে আমাদের শেখার বিচার বিশ্লেষণ করব। এতে করে আমরা সামনে আরও দক্ষভাবে ক্লাবের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারব।

ক. ক্লাব কার্যক্রমের বিবরণ

ক্লাবের নাম: ________________			
ক্লাবের লক্ষ্য:	১.	২.	৩.
অনুষ্ঠিত মিটিং সংখ্যা:			
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নাম:			

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে পরিকল্পিত কাজের বিবরণ	পরিকল্পিত কাজের বর্তমান অবস্থা সমাপ্ত/চলমান	শিক্ষকের মন্তব্য

খ. ক্লাবের সভাপতি/সহ-সভাপতি/সচিব কর্তৃক পূরণীয় (প্রত্যেক সদস্যের জন্য):

ক্লাবের নাম	ভূমিকা (যেমন- সভাপতি/সহ-সভাপতি/সচিব/ সদস্য/সদস্য নয়)	সভাতে উপস্থিতি (যেমন- মোট ৭টির মধ্যে ৫টি)	ক্লাব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ধরন			সভাপতি/ সহ-সভাপতি/ সচিব এর মন্তব্য ও স্বাক্ষর
			খুব সক্রিয়: উদ্যোগী, আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, কাজে সক্রিয় থাকে	মোটামুটি সক্রিয়: কিছু কিছু কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে	ভবিষ্যতে আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ কাম্য: শুধু কিছু বাধ্যতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে	
সক্রিয় নাগরিক ক্লাব						

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

কাঠামো কী

আজ খুশি আপা ক্লাসে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ছবি নিয়ে এসেছেন।

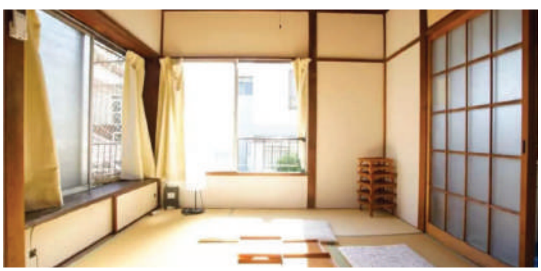

খুশি আপা বললেন,‘চলো আমরা দলে ভাগ হয়ে ছবিগুলো দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।’

ক্রম	প্রশ্ন	উত্তর
১	ঘর-বাড়ি/দালান-কোঠাগুলোর আকার/আকৃতি দেখতে কেমন? কোনো নাম আছে কি?	
২	কী দিয়ে তৈরি করা হয়?	
৩	কী কাজে ব্যবহার করা হয়?	
৪	আবহাওয়া/ পরিবেশের সঙ্গে এগুলোর গঠনের কোনো সম্পর্ক আছে কী? থাকলে কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে?	
৫	কী কাজে ব্যবহার করা হয় সে অনুযায়ী ঘর-বাড়ি/দালান-কোঠাগুলোর গঠনে পার্থক্য রয়েছে কি? থাকলে কী ধরনের পার্থক্য রয়েছে?	

প্রতি দল উত্তরগুলো শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে উপস্থাপন করল। সবাই সবার উপস্থাপনা দেখার পর নীলা আর ফাতেমা বলল–

নীলা: দেখেছ, প্রতিটা ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, স্থাপনা, ইত্যাদি সব কিছুরই একটা নির্দিষ্ট আকার আছে। একে আমরা বলতে পারি কাঠামো (structure)।

ফাতেমা: আরেকটা ব্যাপার দেখেছ? এই কাঠামো কেমন হবে তা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। যেমন– সেটি কি কাজে ব্যবহার করা হয়? কে বা কারা সেটি ব্যবহার করে? সেটি কোন এলাকায় অবস্থিত? এটি কোন সময়কালের? ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

তমাল: আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাঠামো পরিবর্তিতও হয়– তাই না?

ওরা সবাই একমত হলো।

আনাই: আচ্ছা, ঘরবাড়ি, উপাসনালয় ইত্যাদি কাঠামো তো মানুষের তৈরি, এ ছাড়া আশপাশে অন্য কাঠামো আছে না?

ঘণ্টা বেজে গেল, ক্লাস শেষ। খুশি আপা বললেন, বিভিন্ন ধরনের কাঠামো নিয়ে আমরা আরেক দিন আলোচনা করব।

বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান এবং তাদের বৈশিষ্ট্য (পর্বতমালা, মরুভূমি, মালভূমি, মেরু অঞ্চল, তৃণভূমি)

নীলা আজ মাঠে খেলার সময় হোঁচট খেয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছে। তাকে সবাই ক্লাসে এনে বসাল। টিফিনের পরে খুশি আপা ক্লাসে এলে ফ্রান্সিস বলল, আপা নীলা আজ পায়ে ব্যথা পেয়েছে। খুশি আপা বললেন, তাই! কিন্তু কিভাবে? নীলা বলল, আপা আমাদের মাঠের একপাশে যে একটা উঁচু ঢিবির মতো আছে সেখানে দৌড়াতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি। খুশি আপা বললেন, আহারে! খেলার সময় অবশ্যই আমরা সাবধানে খেলব যেন ব্যথা না পাই। লক্ষ্য করলে দেখবে যে আমাদের খেলার মাঠের সব জায়গা কিন্তু সমান নয়, তাই না? গণেশ বলল, হ্যাঁ আপা আমাদের মাঠের দক্ষিণ দিকটায় কিছু কিছু জায়গা একটু উঁচু। খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ; সেরকম

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশও কিন্তু এক রকম নয়– তাই না? সাকিব বলল, হ্যাঁ আপা, আমার বাড়ির পাশে একটা নদী আছে। এ পর্যায়ে খুশি আপা বললেন, চলো আমরা কিছু ছবি দেখি।

প্রশ্ন:

- এসব ভৌগোলিক রূপের পরিচয় জানো কি?
- এদের মধ্যে কি কোনো মিল/ অমিল খুঁজে পাচ্ছ?
- কী কী মিল/অমিল দেখতে পাচ্ছ?
- এ ছাড়াও আর কোন কোন ধরনের ভূমিরূপের নাম জানো?

তখন খুশি আপা বললেন, আচ্ছা কেমন হবে বলতো যদি আমরা প্রত্যেকে এরকম একটি করে জানা অজানা ভূমিরূপের অভিধান বানাই?

তখন আয়েশা বলল, আপা আমরা যে যে ভূমিরূপ সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না সেগুলো যদি ছবি এঁকে কোনো বই/ ইন্টারনেট/বড়োদের সাহায্য নিয়ে অভিধান বানাই তবে কেমন হয়?

খুশি আপা বললেন, নিশ্চয় তোমরা তা করতে পার। একাজে তোমাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইসহ ইন্টারনেট, অন্যান্য বই এমনকি অন্য শ্রেণির পাঠ্য বইয়েরও সাহায্য নিতে পার।

রাতুল বলল, আপা আমরা ভবিষ্যতেও যদি এমন কোনো অজানা ভূমিরূপ সম্পর্কে জানতে পারি সেটাও তো এখানে যুক্ত করতে পারি, তাই না?

খুশি আপা বললেন, নিশ্চয়।

চলো আমরা ওদের মতো একটি ভূমিরূপ অভিধান বানাই

তুহিনের করা ভূমিরূপ অভিধান

পাহাড়

৩০০ মিটারের অধিক কিন্তু ১০০০ মিটারের কম উচ্চতা বিশিষ্ট ভূমিগুলোকে পাহাড় বলা হয়

নদী

মিষ্টি জলের একটি প্রাকৃতিক জলধারা যা সাগর, মহাসাগর হ্রদ বা অন্য কোনো নদী বা জলাশয়ে গিয়ে পড়ে।

তমাল বলল, আমাদের দেশেও তো এরকম অনেক ধরনের ভূমিরূপ আছে। আমরা তো সেগুলো খুঁজে বের করতে পারি।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ তমাল, চলো আমরা বাংলাদেশের একটা মানচিত্র দেখি।

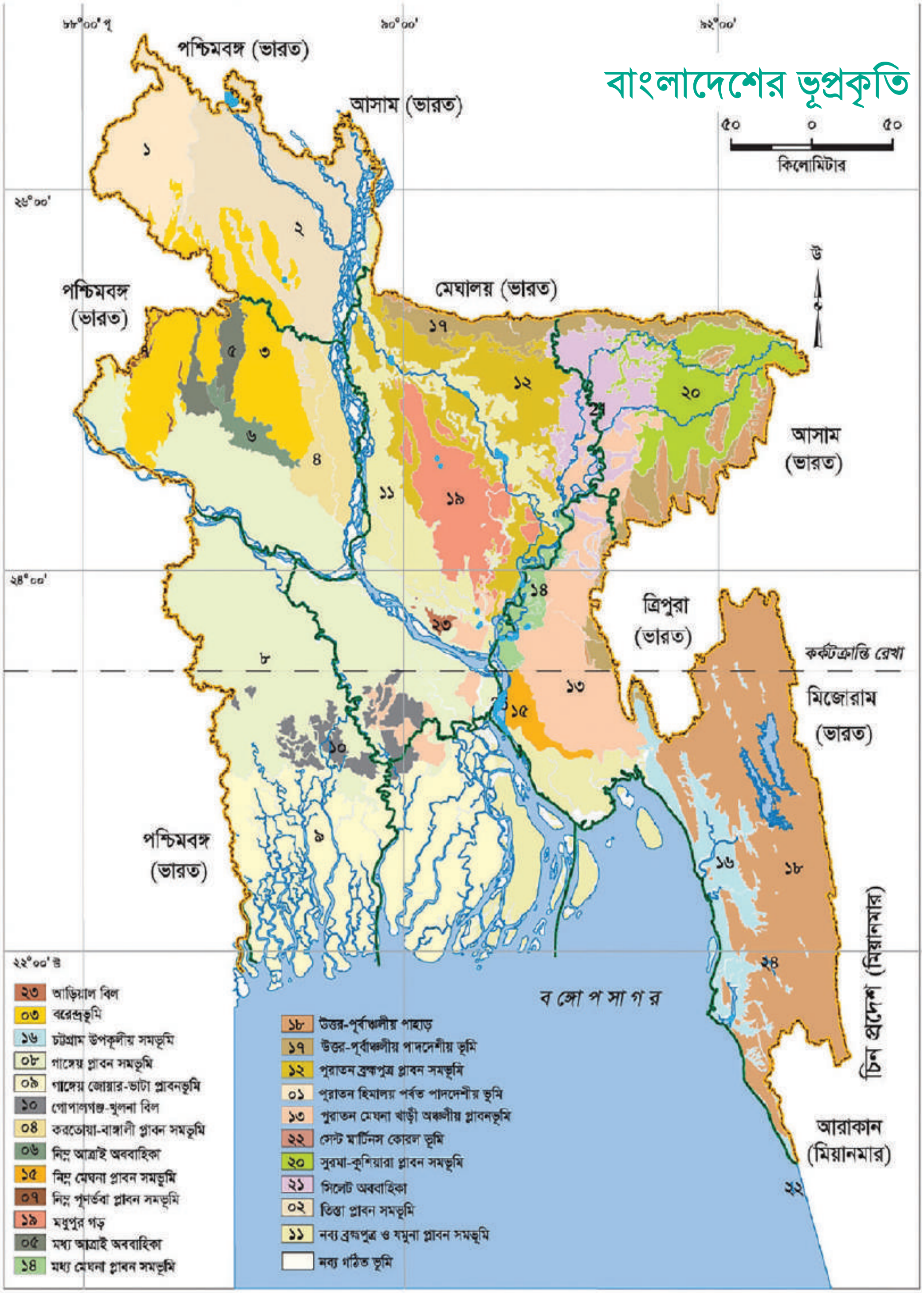

মানচিত্র সংগ্রহ– https://bn.banglapedia.org/index.php/

খুশি আপা বললেন, দেখো তোমরা যে যেখানে থাক, যে এলাকায় চলাচল করো তার মধ্যেও বৈচিত্র্যের শেষ নেই। আনুচিং বলল, ও থাকে পাহাড়ি এলাকায়, নাজিফাদের বাড়ি নদীর পাড়ে। শওকত বলল ও গিয়েছিল মামার বাড়ি সুনামগঞ্জে, সেখানে ও দেখেছে মস্ত বড়ো হাওড়। বর্ষাকালে সেটা হয়ে উঠেছিল সমুদ্রের মতো, তাতে ঢেউও ছিল। ওরা নৌকায় বেড়িয়েছে। কিন্তু সে যখন একবার ওখানে গিয়েছিল শীতকালে, তখন দেখেছে সবটা জুড়ে সবুজ ধানের ক্ষেত। সুবোধ বলল, ও বন দেখে এসেছে– ওরা কয়েক পরিবার মিলে সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়েছিল। রুপা বলল ওর দাদার বাড়ি কক্সবাজার যাওয়ার সময় ওরা ডুলাহাজরা বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক দেখেছে– সেটি অভয়ারণ্য; আর শেষে কক্সবাজারে তো সমুদ্রের সাথেই দেখা– জোয়ারের সময় বড়ো বড়ো ঢেউ দেখেছে। এভাবে তারা আলোচনা করে বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপের একটি তালিকা বানাল। তালিকা তৈরি হলে তারপর তারা ঠিক করল জায়গাগুলো বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত করবে।

আনুচিং বলল, আপা আমাদের পাহাড়ি এলাকাগুলো দেখতে তো খুবই সুন্দর, কিন্তু শীতকালে পানির খুব কষ্ট, আবার বর্ষাকালে পাহাড়ি ঢল নামে– কি যে সমস্যা তখন! আবার কোনো কোনো সময় তো বেশি বর্ষা হলে পাহাড়-ধসও হয়।

খুশি আপা বললেন, আনুচিং যেমনটা বলল তেমন অনেক জায়গায়ই বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এগুলোর সাথেও কিন্তু ভূমিরূপ জড়িত। তখন নীলা বলল, আপা যেমন নদীর সাথে বন্যা? খুশি আপা বললেন, নীলা তুমি একদম ঠিক বলেছ। চলো আমরা সেগুলোও খুঁজে বের করি।

তখন তারা সবাই দলে বসে এক এক দল একটি করে বিভাগ বেছে নিল। এবারে প্রত্যেক দল একটা করে বিভাগের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য মানচিত্রে রঙের মাধ্যমে চিহ্নিত করল এবং সেখানকার প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর তালিকা তৈরি করল যার সাথে ভূমিরূপেরও সম্পর্ক আছে।

চলো আমরাও ওদের মতো করে ভূমিরূপের মানচিত্র এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের তালিকা বানাই।

কাজ শেষ হলে প্রতেক দল ক্লাসের সবাইকে দেখাল এবং কী কী বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে তা বলল। অন্যদের মন্তব্য শুনে ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওরা তালিকাটা যতটা সম্ভব পরিপূর্ণ করে উপস্থাপন করল।

খুশি আপা সবার কাজ দেখে তাদের অভিনন্দন জানালেন এবং বললেন চলো আমরা এখন এমন একটা খেলা খেলব যার মাধ্যমে এখানে বসেই পৃথিবীর সব মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরূপ ও স্থান ঘুরে আসা যায়। সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

খুশি আপা তখন একটা ভূমিরূপ লুডো বোর্ড নিয়ে আসলেন। সবাই তো দেখে অবাক, এ আবার কেমন লুডো? আপা বললেন, আমরা তো আগেই দেখেছি নিয়ম মেনে খেললে সব খেলা সুন্দর মতো হয়, তাই না? এ খেলাটিও আমরা কিছু নিয়ম মেনে খেলব। তোমরা সবাই ছোটো ছোট দলে ভাগ হয়ে গোল হয়ে বসে পড়ো।

দলগতভাবে লুডো খেলার নিয়ম

- প্রতিটি বোর্ডে দুটো দল খেলতে পারবে। প্রতি দলের একজন ক্যাপ্টেন থাকবে।
- টসের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে, কোন দল আগে খেলা শুরু করবে।
- ১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা।
- দলের যে কোনো একজন খেলা শুরু করবে। কে শুরু করবে তা ক্যাপ্টেন নির্ধারণ করবে।
- খেলা চলাকালীন যে কোনো সময় খেলোয়াড় বদল হতে পারবে। তবে একজন বদলি হলে সে পুনরায় আর খেলার সুযোগ পাবে না।
- খেলাটির যেসব নিয়ম বলা আছে সেই অনুসারে খেলতে হবে। (নিয়মাবলি পরিশিষ্ট-৩)
- খেলা সঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে প্রত্যেক বোর্ডের একজন রেফারি নির্ধারণ করতে হবে। রেফারি কে হবে তা দুই দলের ক্যাপ্টেন ঠিক করবে। যে রেফারি হবে সে খেলায় অংশ নিতে পারবে না।
- ১০০ পয়েন্টে আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ এখানে সকল খেলোয়াড়কে পৌঁছাতে হবে। যে দল সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সেই দল জয়ী হবে।

ফাতেমা বলল, আপা আমরা যদি দুই জন মিলে খেলাটি খেলতে চাই তাহলেও তো খেলতে পারব–তাই না? খুশি আপা বললেন, নিশ্চয় পারবে। পরিশিষ্ট-২ এ দেওয়া লুডোর নমুনা অনুযায়ী আমরা বিশ্ব মানচিত্র সংগ্রহ করে একটি বিশ্বভ্রমণ লুডো বানিয়ে নিতে পারি। এরপর পরিশিষ্ট-৩ এ নিয়মাবলি দেখে খেলাটি খেলতে পারি। তারপর সবাই লুডোটি বানিয়ে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে খেলা শেষ করল।

চলো যাই শিক্ষাভ্রমণে

পরের দিন ক্লাসে নীলা হারুনকে বলল, আমাদের দেশে তো অনেক ধরনের ভূমিরূপ আছে আমরা তো সেসব জায়গার কোনো একটিতে শিক্ষাভ্রমণে যেতে পারি! মিলি বলল, চল তাহলে খুশি আপা ক্লাসে আসলে তাঁকে এ বিষয়ে বলি। খুশি আপা ক্লাসে এলে নীলা তাদের মনের ইচ্ছা আপাকে বলল। আপা শুনে বললেন, এ তো খুবই ভালো প্রস্তাব। তবে এ তো অনেক বড়ো আয়োজন। তখন তারা সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করল এ আয়োজনে তাদের কার কার সাহায্য লাগবে এবং কি কি আয়োজন করতে হবে।

চলো ওদের মতো করে আমরাও একটা শিক্ষাভ্রমণের আয়োজন করি।

কাজের তালিকা সম্পূর্ণ হলে চলো মিলিয়ে দেখি

স্থান নির্বাচন	দিন, তারিখ, সময়	যানবাহন	শিক্ষকমণ্ডলী	খাবার	ফি
১. ২. ৩.			১. ২. ৩.	সকাল: দুপুর: রাত:	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

খুশি আপা বললেন, বাহ তোমরা তো বেশ ভালোই আয়োজন করেছ। সালমা বলল, আপা আমরা বিজ্ঞান বিষয়ে পিকনিক আয়োজন করেছিলাম তো আগে। খুশি আপা বললেন, ও আচ্ছা খুব ভালো কিন্তু পিকনিক ও শিক্ষাসফর কি এক?

নাজিফা বলল, না আপা, শিক্ষাসফরে আমরা কোনো জিনিস দেখার মাধ্যমে শিখতে পারি। আরমান বলল, আপা আমরা অনেক ধরনের ভূমিরূপ সম্পর্কে ছবি ও নানা মাধ্যমে জেনেছি, এখন যদি সেগুলো সরাসরি দেখি তাহলে আমাদের জানা জিনিসের সাথে সেটা মিলিয়ে দেখতে পারব। রিপন বলল, তাহলে আপা আমরা যা যা দেখবো তার মধ্যে যদি নতুন কোনো কিছু খুঁজে পাই সেটা আমাদের তৈরি ভূমিরূপ অভিধানে লিখতে পারি। সালমা বলল, আমরা তো সফরে গিয়ে অনেক কিছু দেখব, কত নতুন কিছু জানতে পারব। প্রত্যেকে আমরা একটা করে ভ্রমণ ডায়েরি তৈরি করতে পারি। আর তাতে শিক্ষাসফরে নতুন যত ভূমিরূপ দেখব তার ছবি তুলে বা এঁকে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখে রাখব। আর যখন খুশি সেগুলো দেখতে পারব। রনি বলল, বাহ এটাতো খুবই ভালো প্রস্তাব, কারণ আমরা যখন বড়ো হয়ে যাব তখন এগুলো দেখে কতই না মজা পাব! খুশি আপা বললেন, তোমরা খুব ভালো কথা বলেছ। চলো তাহলে আমরা আমাদের শিক্ষাসফরের আয়োজন শুরু করি। সবাই হাততালি দিয়ে কাজ শুরু করল।

নাসিরের বানানো ভ্রমণ ডায়েরি

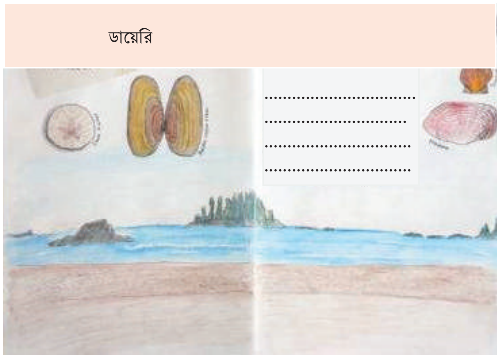

আয়েশার ভ্রমণ ডায়েরি

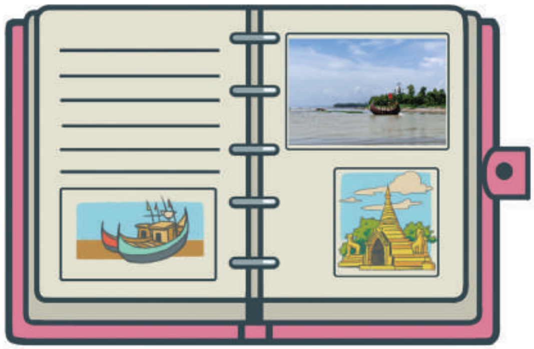

তোমরাও কিন্তু সবাই সফর শেষে ভ্রমণ ডায়েরি তৈরি করে বন্ধুদের দেখাতে ভুলো না

সামাজিক কাঠামো

শ্রেণিকক্ষে ঢুকে খুশি আপা বললেন, প্রাকৃতিক কাঠামো সম্পর্কে তো আমাদের কিছু ধারণা হলো। চলো এবার আমরা সামাজিক কাঠামো নিয়ে কাজ করি। কেমন হয় যদি আমরা একটা গল্প দিয়ে কাজটা শুরু করি।

সবাই খুশি হয়ে উঠল। খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে বই থেকে ধর্মগোলার গল্পটি পড়ি। কে শুরু করতে চাও?

মিলি উঠে দাঁড়াল এবং পড়তে শুরু করল।

ধর্মগোলার গল্প

ডেমরা একটা গতানুগতিক গ্রাম। গ্রামের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি। গ্রামের মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সমাজের রীতিনীতি ও নিয়মকানুন এবং পরোপকারের সংস্কৃতি মেনে চলে। যেকোনো উৎসব একসাথে উদযাপন করে। একবার গ্রামে খুব বন্যা হয়। গোটা গ্রাম ডুবে যায়। মানুষ আশ্রয় নেয় স্কুলের পাকা দালানে। খাবারের সমস্যা ছিল। সরকারি ত্রাণসামগ্রী, এন.জি.ও থেকে প্রাপ্ত রসদ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা পেয়ে গ্রামবাসী বন্যা মোকাবেলা করে। তখন মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ায় ফাঁকা বাড়ি-ঘরে চোরের উপদ্রব বেড়ে যায়। আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য সদর থেকে পুলিশ আসে। বন্যার সময়ে ত্রাণ বিতরণে ইউনিয়ন পরিষদকে তৎপর দেখা যায়। শিক্ষা বিভাগের তৎপরতায় লেখাপড়ার ক্ষতি খানিকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। আসল সমস্যা শুরু হয় তার পরে।

বন্যায় অপুষ্ট ধানসহ সকল ফসল ডুবে গিয়েছিল। গুদামে থাকা ধানও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে আকস্মিকভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তবে গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সমাজ টিকে ছিল। সবাই বিশ্বাস করত একা একা ভালো থাকা যায় না। মানুষের উপকারের জন্য কাজ করতে পারাকে লোকে গর্বের বিষয় বলে ভাবত। ভালো কাজ মনে করত। গ্রামের সব বড়োরা আলোচনায় বসলেন। একজন বললেন, দু'একজন ছাড়া আমাদের সবারই খাবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। একা একা এই সমস্যা মোকাবেলা করা কঠিন হবে। কারণ কারও কাছে চাল আছে, কারও কাছে ডাল, কারও বা আছে সবজি। কারও কাছেই খাবার তৈরি করার মতো সব কিছু একসাথে নেই। কিন্তু আমরা সবার চাল, ডাল, সবজি, তেল, লবণ ইত্যাদি একসাথে করে রান্না করতে পারি। তারপর প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করতে পারি, তাহলে আপাতত সমস্যার সমাধান করা যাবে। সবাই হয়ত সমান পরিমাণ খাদ্যপণ্য দিতে পারবে না, যারা পারবে না তারা শ্রম দেবে, জ্বালানি সংগ্রহ করবে, রান্নায় সাহায্য করবে বা বিতরণের কাজে লাগবে। সবার অংশগ্রহণটাই আসল কথা। খাদ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে শিশু, সন্তানসম্ভবা নারী, অসুস্থ ও বৃদ্ধ। তারপর অন্যরা।

এভাবে সেই সমস্যা বেশ খানিকটা সমাধান করা গিয়েছিল। তবে এরকম ঘটনা তো আবারও ঘটতে পারে। তখন কী হবে? এজন্য সমাজের সব মানুষ আবার বসলেন একসাথে। তারা ঠিক করলেন, তারা আকালের (দুর্ভিক্ষ/অভাব) সময়ের জন্য ফসলের একটি গোলা তৈরি করবেন। এই গোলার নাম দেওয়া হলো ধর্মগোলা। গ্রামে নতুন ধান উঠলে প্রত্যেক পরিবার থেকে এক মণ ধান/চাল, গম, ডাল, কয়েক কেজি করে সরিষা বা অন্য কোনো খাদ্যশস্য নিয়ে একটা স্থানে রাখা হবে। আকালের/দুর্যোগের সময় যে যার প্রয়োজনমতো সেখান থেকে ধান/চাল ধার করবে। আকাল পার হয়ে গেলে আবার যে যা নিয়েছিল তা ফেরত দিয়ে দেবে। ফলে ধর্মগোলায় সবসময় সংকটের জন্য ধান/চাল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ থাকবে।

ধান/চাল সংরক্ষণের জন্য গোলাঘর তৈরি করা হয়। সমাজের প্রতিটা পরিবার এই ধর্মগোলা সমিতির সদস্য। একটা পরিচালনা কমিটি করা হয়। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমসংখ্যায় এই কমিটির সদস্য হয়। ধান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ধার দেওয়া ও ধার শোধ করার জন্য নানান নিয়মকানুনও তৈরি হয়। এই ব্যবস্থা খুব ভালো কাজ করেছিল। সামাজিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সংকট মোকাবেলা করা যায়– এ তারই একটা উদাহরণ। বাংলাদেশের নানান প্রান্তে এই উদ্যোগকে রাইস ব্যাংকও বলা হয়।

এবারে চলো আমরা নিচের ছক ব্যবহার করে ধর্মগোলা গল্পে সমাজের কী কী প্রতিষ্ঠান ও আইন-কানুনের কথা বলা হয়েছে তা খুঁজে বের করি।

ক্রম	কাজ / ভূমিকার নাম	সমাজের প্রতিষ্ঠান বা মূল্যবোধ-রীতিনীতির নাম
১.	গ্রামের মানুষকে একতাবদ্ধ হতে কী সহায়তা করেছিল?	সমাজের নিয়ম-কানুন, রীতিনীত, পরোপকারের সংস্কৃতি
২.	বন্যার সময় মানুষ কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল?	
৩.	ত্রাণ সামগ্রী কার কাছ থেকে এসেছিল?	
৪.	ত্রাণ সামগ্রী কে বিতরণে তৎপর ছিল?	
৫.	আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ কে করে?	
৬.	পড়ালেখার ক্ষতি কার তৎপরতায় খানিকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল?	
৭.	গ্রামে কী টিকে ছিল?	
৮.	ধর্মগোলা কারা মিলে তৈরি করেছিল?	

সবাই উপরের ছকটি ব্যবহার করে গল্পে সমাজের যে সকল প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কথা বলা আছে তা চিহ্নিত করল।

চলো আমরাও ওদের মতো করে উপরের ছকটি ব্যবহার করে ধর্মগোলা গল্পে উল্লিখিত বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চিহ্নিত করি!

খুশি আপা বললেন, আমরা খুব সুন্দরভাবে গল্পে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি চিহ্নিত করতে পেরেছি। এবার চলো সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিই।

সমাজ থেকে সামাজিক কাঠামো

সমাজ কী?

কাদের নিয়ে, কী কী উপাদানে ও কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা সমাজ গড়ে ওঠে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর বোঝার জন্য আমাদের আগে সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে জানতে হবে। এর মাধ্যমে সমাজ কীভাবে সংগঠিত হয়— তা বুঝতে পারব।

খুশি আপা বললেন, সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এইসব প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ধরনকে এক কথায় সামাজিক কাঠামো বলা যায়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এবার চলো, আমরা 'ধর্মগোলা' গল্পটি থেকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষে-মানুষে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়ার অংশগুলো খুঁজে বের করি।

প্রথমেই নাসির বলল, ধর্মগোলা গল্পে আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেকগুলো পরিবারকে দেখতে পাই। বন্যার পরে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের খাবারের সংকট কাটিয়ে ওঠে। এভাবে তাদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আয়েশা বলল, প্রতিটি পরিবার নিজেদের চাল-ডাল-সবজি-তেল-লবণ, যার কাছে যা ছিল, তা-ই সমাজের সকলের জন্যে এক জায়গায় জড়ো করেছিল। এমনকি যাদের কাছে কোনো খাবার ছিল না, তারাও পরিশ্রম করে সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রেখেছিল। এর মাধ্যমে ডেমরা গ্রামে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে বা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।

গণেশ বলল, গল্পে কেবল পরিবার নয়, আরও কিছু প্রতিষ্ঠান মানুষের উপকারে কাজ করেছে। যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ একটি প্রতিষ্ঠান, সে ত্রাণ বিতরণ করেছে। সেই ত্রাণ এসেছে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কাছ থেকে। মোজাম্মেল বলল, ঠিক তাই। স্কুল, শিক্ষা বিভাগ, পুলিশ— এসব প্রতিষ্ঠানও সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছে। শিহান বলল, ধর্মগোলার ব্যবস্থাপনার জন্য আবার নতুন একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে– ধর্মগোলা সমিতি। এই প্রতিষ্ঠানও ডেমরা গ্রামের মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছে।

আনাই বলল, এভাবেই ধর্মগোলা গল্পে সমাজের মানুষে-মানুষে, মানুষে-প্রতিষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে।

খুশি আপা ওদের উত্তর শুনে দারুণ খুশি হলেন। বললেন, কী চমৎকার করে বুঝিয়ে বললে! এবার তাহলে বলো তো, ডেমরা গ্রামের মানুষ আর প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার এইসব সম্পর্ক গড়ে উঠল কীভাবে? কেন তারা পারস্পরিক যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়া করল?

বুশরা বলল, আমি জানি! নিজেদের মঙ্গল এবং অন্যদের উপকার করার জন্য! তখন খুশি আপা বললেন, নিজেদের মঙ্গল সবাই চায়, কিন্তু কেন ওরা অন্যের উপকার করতে চাইল? নন্দিনী বলল, ডেমরা গ্রামের দু'একটি পরিবারের কাছে ঠিকঠাক খাবার ছিল, কিন্তু বাকি সকলের কাছে সবকিছু ছিল না। অনেকের কাছে কিছুই ছিল না। ওরা দেখল, সকলেরটা মিলিয়ে একসঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা হলে সকলেরই উপকার হয়। তারা বুঝেছিল নিজের ভালো করতে গেলে অন্যের ভালোটুকুও দেখতে হবে। আনুচিং বলল, নিজের ভালোর জন্য সবাই অন্যের উপকার করেছে। জাভেদ বলে উঠল অর্থাৎ ওরা বিশ্বাস করত একা একা ভালো থাকা যায় না! এবং ওরা অন্য মানুষের উপকার করতে গর্ব বোধ করত! সেটাকে ভালো কাজ মনে করত। খুশি আপা জানতে চাইলেন, কেন ওরা অন্যের উপকার করাকে ভালো কাজ বলে মনে করত বলে মনে হয়? মিলি বলল, নিশ্চয়ই ওরা অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছে, সমাজে কেউই সবকিছু একা করতে পারে না। আবার অন্যের উপকার করলে সবাই তাকে ভালো বলে। তা থেকে ওরা বুঝেছিল সকলে মিলেমিশে ভালো থাকতে পারলেই নিজেরও মঙ্গল সমাজেরও মঙ্গল হয়, সকলের কল্যাণ হয়।

খুশি আপা বললেন, দারুণ! ঠিক তাই! আর এই যে মানুষের নানারকম বিশ্বাস; কোন কাজটা ভালো আর কোন কাজটা মন্দ– এইসব ধারণাগুলো সমাজে মানুষের আচরণ কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়। অধিকাংশ মানুষই সমাজের কাছে 'ভালো' হিসেবে পরিচিত হতে চায়। তাই তারা সমাজ যে কাজগুলোকে ভালো বলে মনে করে, সেগুলো করার চেষ্টা করে। এই সব বিশ্বাস এবং ভালো-মন্দের বোধকে আমরা মূল্যবোধ বলে জানি। আবার

সমাজে এমন কিছু নিয়ম আছে যেগুলো মানুষ বহু বছর ধরে পালন করে আসছে। সমাজের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মানুষ সাধারণত কোনো রকম প্রশ্ন ছাড়াই এ সব নিয়ম পালন করে; সেসবকে আমরা রীতি-নীতি বলে জানি। যেমন: শিক্ষক ক্লাসে এলে উঠে দাঁড়ানো, কারও সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করা, অতিথিকে আপ্যায়ন করা।

'ধর্মগোলা' গল্পে যেমন দেখেছি, শিশু, সন্তানসম্ভবা নারী, অসুস্থ এবং বৃদ্ধদের আগে খাবার দেওয়া হয়েছিল। আবার সমাজের প্রত্যেকটা পরিবার ছিল ধর্মগোলা সমিতির সদস্য। আবার এই বিষয়গুলো প্রচলিত মূল্যবোধ ও রীতিনীতি থেকে এসেছে পরিচালনা কমিটিতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও সমান সংখ্যায় কমিটির সদস্য করার ধারণা নতুন। এভাবে প্রচলিতের পাশাপাশি নতুন ধারণা থেকেও মূল্যবোধ ও রীতিনীতি তৈরি হয়। ধান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ধার দেওয়া ও ধার শোধ করার জন্য নানান নিয়মকানুন তৈরি হয়েছিল, সেগুলোও সমাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। এসব অভ্যাস সমাজের সঞ্চিত জ্ঞানের ফল এবং তা থেকে তৈরি হয়েছে মূল্যবোধ ও রীতিনীতি। এমনি করে এইসব সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলোর মাধ্যমে দেশের আইন-কানুনও তৈরি হয়। সমাজের মানুষ এসব মেনে চলে। নইলে নানারকম শাস্তিও পেতে হয়।

আসিফ বলল, হ্যাঁ, আপা। ধর্মগোলা গল্পে আমরা দেখেছি, যখন গ্রামে চোরের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল, তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ এসেছিল। পুলিশ নিশ্চয়ই চোরদের ধরে নিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা পারস্পরিক সম্পর্ক বা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুশৃঙ্খল আন্তঃসম্পর্ককে বলা হয় সামাজিক কাঠামো। এর মধ্যে মানুষ একত্রে বসবাস করে ও মানুষে-মানুষে সম্পর্ক বা আদান-প্রদান ঘটে; তারা মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিয়মকানুন ও রীতিনীতি তৈরি করে। এগুলোর মাধ্যমেই আবার মানুষে-মানুষে মিথস্ক্রিয়ার বা সম্পর্কের ধরন নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিয়মকানুন ও রীতিনীতি ইত্যাদি মানুষের আচার-আচরণ কেমন হবে তা ঠিক হয়।

খুশি আপা বললেন, এবার চলো, আমরা প্রত্যেকে নিজের এলাকার সমাজ থেকে কোনো একটি সম্মিলিত উদ্যোগ বা এরকম একটি বিষয় চিহ্নিত করি। তারপর সেই উদ্যোগ বা বিষয় থেকে মানুষে-মানুষে, মানুষে-প্রতিষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে গড়ে ওঠা সম্পর্ক অনুসন্ধান করি। আমরা নিচের ছকটিতে সেই মিথস্ক্রিয়ার বর্ণনা লিখব:

এরপর খুশি আপা বললেন, আচ্ছা বলো তো, আমাদের দেশের ছেলে আর মেয়েদের পোশাক কেমন?

সবাই একযোগে বলে উঠল, মেয়েদের ফ্রক, কামিজ, শাড়ি আর ছেলেদের শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি। খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ, কিন্তু মেয়েদের আর ছেলেদের পোশাক কেমন হবে তা কে ঠিক করল?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

নীলা বলল, আমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে আমরা শিখি। খুশি আপা বললেন, বাবা-মা কী করে জানলেন, কার কোন পোশাক পরা উচিত? শামীমা বলল, দাদা-দাদি, নানা-নানিদের কাছ থেকে!

খুশি আপা হেসে বললেন, আবারও যদি একই রকম প্রশ্ন করি, দাদি-নানিরা জানলেন কীভাবে? তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই দাদি-নানিদের বাবা-মায়ের কথা বলবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের কাট-ছাঁট একটু বদল হলেও ছেলে-মেয়ের পোশাকের একটা নির্দিষ্ট ধরন এবং ভিন্নতা আগে থেকেই আছে। আমরা সাধারণত সেগুলো মেনে চলি। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের জন্মের আগেই আমাদের পোশাক কেমন হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায়।

এমনিভাবে আমাদের জন্মের আগেই সমাজ কীভাবে সংগঠিত হবে বা সামাজিক কাঠামো কেমন হবে তা নির্ধারিত হয়ে আছে। সামাজিক কাঠামো আমাদের আচার-আচরণকে নির্দিষ্ট করে দেয়। আমাদের কোন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, কোথায় কী বলা উচিত, কেমন পোশাক পরা উচিত, কার সাথে কেমন আচরণ করা উচিত— এসবের প্রায় সবই সামাজিক কাঠামো দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা অনুসরণ করি মাত্র। তবে সামাজিক কাঠামোও অপরিবর্তনীয় নয়। খুব ধীরে হলেও এই কাঠামো বদলায়।

- পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সামাজিক দল ও সকল প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে মানুষ বাঁচে, বাড়ে ও এর অংশ হয়ে ওঠে— এই সবকিছুর সম্মিলিত রূপকে সামাজিক কাঠামো বলা যায়। এইসব সামাজিক দলের মধ্যে থাকে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ইত্যাদি। এর মাধ্যমে মানুষে-মানুষে সর্ম্পক তৈরি হয়, এই সম্পর্ক সমাজে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে।

- সামাজিক কাঠামো মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়, নিজের অবস্থানের উন্নয়ন ঘটানো এবং অন্যদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়। এখানে ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-প্রতিবেশীর গণ্ডি পেরিয়েও অপরিচিত গণ্ডির মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার পরিসর পায়। এর মাধ্যমে সে সমষ্টির অংশ হিসেবেও নিজেকে উপস্থাপন করে।

- সামাজিক কাঠামোর উদ্দেশ্য একটা দলে বসবাসরত মানুষের সম্মিলিত লক্ষ্য পূরণ করা। সবাইকে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করা। সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা।

ধরা যাক, শাপলা বারো বছরের একটি মেয়ে। সে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। সে নিজেকে একজন স্বতন্ত্র বা আলাদা ব্যক্তি হিসেবে বুঝতে শিখছে। শাপলা স্কুলের ফুটবল দলে যোগ দিয়েছে। কারণ সে খেলাটা উপভোগ করে। এভাবে খেলতে খেলতে তার কিছু বন্ধু তৈরি হয়। সময়ের সাথে সাথে, এই ফুটবল দলটি শাপলাকে একজন ভাল খেলোয়াড় হিসেবে দেখতে পায়। আবার একইসাথে সামাজিকভাবে একজন দলগত খেলোয়াড় (টিমমেট) হিসেবে গড়ে তোলে। তার দলের খেলোয়াড়, কোচ, শিক্ষক, অন্য দলের খেলোয়াড়, ফুটবলপ্রিয় দর্শকদের সাথে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ একজন ব্যক্তি হিসেবে তাকে অনন্য (অন্যদের চেয়ে আলাদা) করে তোলে। অন্যদিকে শাপলার বোন নাজিফা বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য হয়। তার বন্ধু, পরিচিত জন, যোগাযোগ সবই বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। ফলে, একই পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও নাজিফার ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটে শাপলার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে। দুই বোনের সামাজিক যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ায় অর্থাৎ সামাজিক কাঠামোর উপাদানে ভিন্নতা থাকার কারণে

তাদের ভাষা চিন্তায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। তবে একই পরিবারের সদস্য হওয়ায় অনেক বিষয়ে তাদের মিলও রয়েছে। এরকম ঘটনা সমাজের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, সামাজিক কাঠামো ব্যক্তি ও সমাজের মানুষের জন্য কতটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ

সামাজিক কাঠামো যেসব উপাদানে তৈরি হয়, সেগুলোকে মোটাদাগে দুটি ভাগ করা যায়:

১. সামাজিক বিধি: এর মধ্যে রয়েছে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি। এগুলো মানুষের চিন্তা ও সামাজিক আচরণ কেমন হবে তা নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে।

২. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও দল: এখানে রয়েছে, পরিবার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম, সরকার ও রাষ্ট্র ইত্যাদি— যাদের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়।

মানুষে-মানুষে সামাজিক সম্পর্ক বা যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও দলের সৃষ্টি হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও দলগুলো সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি। একজন মানুষ একই সঙ্গে সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দলে অবস্থান করে। সেখানে সে নিজের অবস্থান অনুযায়ী সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদির আলোকে ভূমিকা পালন করে।

আমাদের শরীরের যেমন চোখ, নাক, মুখ. কান, হাত, পা, মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একসঙ্গে মিলিয়ে মানব শরীর তৈরি হয়, এরা সবাই কাজ করলে আমাদের শরীর ঠিকঠাক কাজ করে তেমনই সমাজও নানা প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতির সমন্বয়ে সচল থাকে। এগুলোকে বলা যায় সামাজিক কাঠামো। আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিশেষভাবে আমাদের শরীরে বিন্যস্ত আছে। এই বিন্যাসকে আমরা শারীরিক কাঠামো বলতে পারি।

মনে রাখতে হবে সমাজ হলো একটি বিমূর্ত বিষয়, তাকে চোখে দেখতে পাই না; বলতে পারি না, ওই দেখো সমাজ যাচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তি বা পরিবারকে দেখতে পাই। দলগুলোকে দেখতে পাই। ব্যক্তি এবং দল মিলে সমাজ তৈরি হয়। ব্যক্তির আলাদা আলাদা অবস্থান। কেউ বাবা, কেউ মেয়ে, কেউ শিক্ষক। আছে ধনী-দরিদ্র. নারী-পুরুষ, শিশু-বয়োজ্যেষ্ঠ। তাদের ভূমিকা বা কাজও আলাদা আলাদা। সমাজে রয়েছে আলাদা আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা আলাদা পরিচয়, আলাদা আলাদা মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ব্যক্তি এবং দল। এইসব দল, প্রতিষ্ঠান, এখানে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি সমাজ তৈরির যাবতীয় উপাদান সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত হয়ে সামাজিক কাঠামো তৈরি করে।

সামাজিক অবস্থান

বয়স, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিচিতি, খ্যাতি, পদ, শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি, লিঙ্গ, পারিবারিক ঐতিহ্য ইত্যাদি একজন মানুষের সামাজিক অবস্থান তৈরি করে। সমাজে বা একটি দলের মধ্যে একজন ব্যক্তি কতটা সম্মান বা গুরুত্ব পাবেন তা তার সামাজিক অবস্থানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। কখনো কখনো সমাজে তার ভূমিকার মাধ্যমেও ব্যক্তির গুরুত্ব ও সম্মান নির্ধারিত হয়, তাতে পূর্বের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সামাজিক ভূমিকা

কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে সমাজ কোনো বিশেষ মানুষের কাছে যে মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা ও আচরণ প্রত্যাশা করে তাকেই সাধারণভাবে সামাজিক ভূমিকা বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ সমাজে তার অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন বা আচরণ করে। মানুষ সাধারণত এসব কাজ করার সময়, সমাজ তার কাছে যে আচরণ প্রত্যাশা করে তা পূরণ করার চেষ্টা করে। সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হলে সামাজিক ভূমিকারও পরিবর্তন হয়। যেমন, সমাজ একজন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে যা আশা করে, একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাছ থেকে তা আশা করে না। সমাজ ছেলে এবং মেয়েদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ভূমিকা প্রত্যাশা করে। তবে সমাজের প্রত্যাশার বাইরে গিয়েও তাদের ভূমিকা পালনের সক্ষমতা থাকে। শিশু এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সামাজিক ভূমিকাও আলাদা হয়।

সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ

একটি দলের সদস্যদের নিজেদের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া, আবার একটি দলের সঙ্গে আর একটি দলের মিথস্ক্রিয়াকে সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ বলে। যেমন: সালমা স্কুলের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সদস্য। এই কারণে তার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ একটি ক্লাবের সদস্য হওয়ার কারণে তার আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ ঘটতে পারে। এভাবে সালমা তার ক্লাবের সদস্য হবার কারণে আরও অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। এই যে সালমার সাথে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ও সম্পর্কের জাল তৈরি হলো এটাই হচ্ছে সালমা ও তার ক্লাবের সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ।

দল ও প্রতিষ্ঠান

দল ও প্রতিষ্ঠান বলতে সামাজিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী ধরনকে বোঝানো হয়। এধরনের কিছু প্রচলিত দল ও প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে পাই, যেমন পরিবার, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আইন, সরকার, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা। দল ও প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো তৈরি করে এবং এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করে। ধরা যাক, খুশি আপার ক্লাসে বিয়াল্লিশ জন শিক্ষার্থী আছে। এর মানে হচ্ছে, খুশি আপা তার বিয়াল্লিশ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে প্রায় চুরাশি জন অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিয়াল্লিশটি পরিবারের সঙ্গে খুশি আপার যোগাযোগ ও জানাশোনার সুযোগ হয়েছে।

সামাজিক কাঠামো হিসেবে পরিবার

সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক উপাদান হলো পরিবার। একজন মানুষের জন্য প্রথম সামাজিক দল বা সংগঠন হচ্ছে পরিবার। পরিবার একজন ব্যক্তির সামাজিক বিকাশে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করে। সে কী খাবে, কীভাবে কথা বলবে, কী পরবে, কী কী কাজ করবে ইত্যাদি পরিবারের মাধ্যমে অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। একজন মানুষ পরিবারের মাধ্যমে বুঝতে পারে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে তাকে কী ভূমিকা রাখতে হবে, সে কী হবে, কী করলে তাকে ভালো বা খারাপ বলে মনে করা হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সুমনের পরিবার তাকে শেখাল যে, সে যদি বাইরের লোকদের সাথে যোগাযোগের সময় নম্র ও ভদ্র থাকে, তাহলে তাকে সবাই ভালো বলবে। সুমন যদি পরিবারের এই শিক্ষা মান্য করে তাহলে সে অন্যদের কাছে ভদ্র ছেলে হিসেবে পরিচিত হবে। আবার সালমা যদি তার পরিবারের সদস্যদের সব সময়ে রুক্ষ আচরণ

করতে দেখে, সে সেরকম আচরণে অভ্যস্ত হবে। সে তখন সকলের কাছে অভদ্র হিসেবে পরিচিত হবে। লোকে তাকে অপছন্দ করবে। এভাবে সামাজিক কাঠামোয় ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা তৈরিতে পরিবারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হচ্ছে কোনো এলাকার মানুষের দলগত আচরণের বিশেষ ধরন। জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সব আচরণই আমাদের সংস্কৃতির অংশ। যেমন– আমরা কী ধরনের খাবার খাই, কীভাবে খাই, ভাষা, পোশাক, খেলাধুলা, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসসহ আরও অনেক কিছু। এক এক দেশের বা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে সংস্কৃতির নানা উপাদানের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন, বাংলাদেশের সমূদ্র উপকূলীয় এলাকার সাথে উত্তরবঙ্গ এলাকার মানুষের কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য দেখা যায়। আবার পাহাড়ি এলাকা ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের সাথে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনেক বেশি। এই সব বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি নিয়েই আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

আবার অনেক সময় একটি দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের মানুষের কাছে বিচিত্র বা চমকপ্রদ মনে হতে পারে।

যেমন–

১. দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনিজুয়েলাতে যদি তোমাকে কোনো বন্ধু তার বাসায় নিমন্ত্রণ করে, আর তুমি যদি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হও, তাহলে ওরা তোমাকে ভাববে পেটুক আর লোভী। ঠিক সময়ের চেয়ে একটু দেরি করে যাওয়াটাই সেখানকার সংস্কৃতি।

২. অন্যদিকে চীনে গিয়ে কোনো বন্ধুকে ভুলেও অভিনন্দন জানাতে ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া যাবে না। কারণ চীনের সংস্কৃতি অনুযায়ী শুধু মৃত মানুষকেই ফুলের তোড়া দেওয়ার প্রচলন রয়েছে।

তবে সাধারণত প্রত্যেকের কাছেই তার নিজের সংস্কৃতি খুবই ভালো এবং উপযোগী মনে হয়। এজন্য সংস্কৃতির কোনো ভাল বা মন্দ বিচার করা চলে না। এক দেশের ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসের সংস্কৃতির সাথে অন্য দেশের ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসের কোনো রকম তুলনা করা চলে না। পৃথিবীতে এতো বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আছে বলেই পৃথিবীটা এতো সুন্দর মনে হয়।

আইন-কানুন, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও প্রথা

সামাজিক কাঠামো স্থানীয় ও জাতীয় উভয় প্রকার আইন-কানুন, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ নিজে সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে এইসব নিয়মকানুন, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও প্রথাকে মেনে চলে। জীবনযাপনের নানান বিষয়ে, যেমন– ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, জমিজমার মালিকানা, উত্তরাধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো এই কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সরকার

সরকার আইন-কানুন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন-পুলিশ, আনসার প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিকে সারাজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়।

রাষ্ট্র

রাষ্ট্র আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কাঠামো হলেও রাষ্ট্র নিজে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর অংশ। আবার অন্যদিকে, রাষ্ট্র তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন করতে ভূমিকা রাখে। নাগরিকদের নানান সেবা (শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তা, যোগাযোগ, বিনোদন প্রভৃতি) প্রদান করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়।

অনুসন্ধানী কাজ:

খুশি আপা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি পূর্বে আমাদের সংস্কৃতি কেমন ছিল? এখন আমরা আমাদের সংস্কৃতি যেমন দেখছি আগেও কি একইরকম ছিল? অনেক প্রশ্ন এখন আমাদের মনে তাই না? চলো আমরা এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী কাজ করে ফেলি। আমরা অনুসন্ধানের ধাপগুলো অনুসরণ করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করি। এই জন্য আমাদের প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। চলো আমরা খুঁজে বের করি আমাদের দেশের সংস্কৃতি আগে কেমন ছিল? আলোচনা করে ঠিক করি কত বছর আগের সংস্কৃতি তথ্য সংগ্রহ করতে চাই। এরপর আমরা কোনো ৩-৪ জন বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। প্রাপ্ত তথ্য আমরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে পারি। দলগতভাবে ঠিক করি আমরা কীভাবে উপস্থাপন করব। হতে পারে পোস্টার উপস্থাপন, দেয়ালিকা বা প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদি।

সমাজ, নদী,
সমুদ্র, রাষ্ট্র, মরুভূমি, সমতল
ভূমি, ধর্ম , পর্বত, সরকার,
আইন, সংস্কৃতি

খুশি আপা এবার বললেন, এতক্ষণের আলোচনা থেকে চলো আমরা নিচের কাজটি করার চেষ্টা করি। প্রথমে ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে– আমাদের পরিবারে ও সমাজে পরিবারের সদস্যদের কার অবস্থান কোথায় এবং সমাজে তাঁদের ভূমিকা কী? তা খুঁজে বের করি। এরপর নিচের ছকটি পূরণ করি

চলো এবার আমরা নিচের ছক পূরণ করি

পারিবারিক অবস্থান ও ভূমিকা	সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক

সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনে আশপাশের পরিবেশের প্রভাব

নীলা, রনি ও সালমা স্কুলে আসার পথে দেখল একটা খালের পাশে অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কাছে যেতে দেখতে পেল অনেক মাছ মরে ভেসে উঠেছে। দেখে ওদের মন খারাপ হয়ে গেল।

সালমা বলল আচ্ছা মাছগুলো কেন মারা গেল?

নীলা বলল, আমার মনে হয় খালের পানি খারাপ হয়ে গেছে, তাই মাছ মরে যাচ্ছে, কারণ দেখছিস না পানি কেমন যেন কালো রঙের হয়ে গেছে।

রনি বলল, আরও দেখ খালের পাশে একটা কারখানা আছে এবং ওই কারখানার সব ময়লা পানি খালে গিয়ে পড়ছে।

আয়েশা বলল, আমাদের বাড়ির পাশে একটা ইটভাটা আছে, ওখানকার কালো ধোঁয়া যখন বেশি বের হয়, তখন আমার খুব শ্বাসকষ্ট হয়।

সাকিব বলল, কলকারখানা দেখছি অনেক কিছু সমস্যা তৈরি করছে। আচ্ছা আমরা তো অনুসন্ধান করতে পারি কলকারখানা আমাদের পরিবেশের উপর আরও কী কী প্রভাব ফেলছে?

আয়েশা বলল, তাহলে তো আমাদের একটা কারখানায় যেতে হবে দেখতে। কারণ কারখানা তো আমাদের লাগবে। কেবল দেখতে হবে সেগুলো যেন পরিবেশের ক্ষতি না করে।

রিনা বলল, হ্যাঁ আবার অনুসন্ধানের বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্নও তৈরি করতে হবে। তাহলে চলো আমরা খুশি আপাকে ব্যাপারটা বলি।

খুশি আপা সব শুনে বললেন, এ তো ভালো কথা, তাহলে তোমরা কারখানায় গিয়ে কী কী দেখতে চাও তা প্রশ্নের আকারে এর তালিকা তৈরি করে ফেলো।

তখন তারা দলে ভাগ হয়ে প্রশ্ন তৈরি করল:

কাঁচামাল বিষয়ের অনুসন্ধানের ছক

কাঁচামাল	কাঁচামালের উৎস	কাঁচামাল সংগ্রহ ও ব্যবহারের কারণে পরিবেশের উপর প্রভাব	ফলাফল

কাঁচামাল ব্যবহার করে দ্রব্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি/ শক্তি বিষয়ক অনুসন্ধানের ছক

জ্বালানি/শক্তি	জ্বালানি/শক্তির উৎস	জ্বালানি/শক্তি সংগ্রহ ও ব্যবহারে পরিবেশের উপর প্রভাব	ফলাফল

বর্জ্য বিষয়ক অনুসন্ধানের ছক

বর্জ্য	বর্জ্যের উৎস	পরিবেশের উপর বর্জ্যের প্রভাব	ফলাফল

তারপর তারা খুশি আপার সহযোগিতায় একটি কারখানায় গেল পরিদর্শন করতে এবং অনুসন্ধান শেষে তারা প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সবার সামনে দলগতভাবে উপস্থাপন করল।

চলো, আমরাও ওদের মতো প্রশ্ন তৈরি করে কারখানা পরিদর্শনে যাই।

পৃথিবীব্যাপী প্রভাব

পরের দিন ক্লাসে রনি বলল, আমরা তো আমাদের আশপাশের পরিবেশের উপর কলকারখানার প্রভাব বের করলাম, কিন্তু এ প্রভাব কি শুধু আমাদের চারপাশেই থাকে, নাকি পৃথিবীজুড়েই পড়তে পারে?

মুনিয়া বলল, কলকারখানা তো সব দেশেই আছে, তাহলে তো পৃথিবীর অনেক সমস্যা হচ্ছে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ মুনিয়া, চলো আমরা কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে তা খুঁজে বের করতে পারি কিনা দেখি।

এখন তিনটি দলে ভাগ হয়ে তারা পরীক্ষাগুলো শুরু করল।

প্রথম দল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি গাছের ছায়াযুক্ত স্থানে এক খন্ড বরফ, একটি পাত্র ও একটি ঘড়ি রাখবে; দ্বিতীয় দল রোদের মধ্যে এক খন্ড বরফ, একটি পাত্র ও একটি ঘড়ি রাখবে; এবং তৃতীয় দল দুটি থার্মোমিটার, একটি মুখবন্ধ কাচের গ্লাস ও একটি থার্মোমিটার রাখবে। ১ ও ২ নং দল তাদের বরফটি সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার অর্থাৎ গলনের সময় পরিমাপ করবে। ৩ নং দল তাদের দুটি থার্মোমিটারের একটিকে রোদের মধ্যে রাখবে ও অন্যটি কাচের গ্লাসে রেখে মুখ বন্ধ করে রোদের মধ্যে রেখে দেবে এবং কিছুক্ষণ পর পর তাপমাত্রার পরিমাণ রেকর্ড করবে। পরবর্তী ১০-১৫ মিনিট ওরা যার যার অবস্থানে অপেক্ষা করবে।

চলো আমরাও ওদের মতো করে দলে ভাগ হয়ে পরীক্ষাগুলো করে দেখি

এরপর ৩টি দলই ক্লাসে এসে কারণসহ তাদের অভিজ্ঞতার ছক পেপারে লিখে অন্য দুই দলের সঙ্গে শেয়ার করল।

১ ও ২ নং দলের অভিজ্ঞতা

দল	বরফ গলার সময়	কারণ
১ নং দল		
২ নং দল		

৩ নং দলের অভিজ্ঞতা

১ নং থার্মোমিটার	১০-১৫ মিনিট পরে তাপমাত্রা -------
২ নং থার্মোমিটার	১০-১৫ মিনিট পরে তাপমাত্রা--------

মিলি বলল, আমরা তো পরীক্ষণে দেখলাম যেখানে গাছ ছিল না সেখানে তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেল।

সাকিব বলল, তার মানে গাছপালা কমে গেলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও বেড়ে যাবে।

খুশি আপা বললেন, সেটা আসলে কেমন হবে চলো আমরা একটা কমিকস পড়ে তা দেখি:

সবুজের পথে পৃথিবী

তোমরা আজ খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে
হুররে! হা হা এটা আমাদের জন্য সেরা একটি ক্যাম্পিং হতে যাচ্ছে!
মা, আমি কি একটু সমুদ্রের পাশে ঘুরতে যেতে পারি?
হ্যাঁ, যাও তবে বেশিদুর যাবে না। আর নোংরা ময়লা ধরবে না। ওখানে দেখলাম অনেক আবর্জনা। তাড়াতাড়ি ফিরবে। তোমার জন্য একটি চমক আছে।
ইশ! কি ময়লা। আমার যদি সুপার পাওয়ার থাকত এক নিমেষে সব ময়লা পরিষ্কার করে সমুদ্র সৈকত সুন্দর করে তুলতাম।

আহ্! হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম! এই নরম বালিতে একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক।
আহা! এখানটার বালি কী গরম একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক!
আরে, একি! আমি তো হাওয়ায় উড়ছি। আমাদের ক্যাম্প কোথায়! এতো পানি! সমুদ্র এতো বড়ো হলো কিভাবে!
তুমি কে?
আমি প্রকৃতি, দূষিত পৃথিবীকে ভালো করার জন্য এসেছি।
আমি ব্রতী, কিন্তু পৃথিবী দূষিত হলো কখন? আমরা তো ক্যাম্প করেছিলাম।
আমি তোমাকে তোমার সময় থেকে ১৫০ বছর ভবিষ্যতে নিয়ে এসেছি! চলো দেখাই তোমাকে কীভাবে পৃথিবী দূষিত হয়েছে।

এটা কোথায়? এতো গরম!
উত্তর মেরু...
কিন্তু, এখানে বরফ কোথায়!
সব গলে পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছে...
এতো বরফ গলে গেল কেমন করে?
চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি
পৃথিবী কেনো দূষিত হলো।

প্যাঁঃ! পুঁঃ!
পিপ!
পিপ! পিপ!
এতো কালো ধোঁয়া... দেখা যাচ্ছে না কিছুই, আর কি দুর্গন্ধ...ওয়াক... আর এতো শব্দ। কান ফেটে যাচ্ছে।
হ্যাঁ, আগের মানুষরা গাছপালা কেটে যেখানে সেখানে কলকারখানা বানিয়েছে, তার ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস বেড়ে গেছে এবং এর ফলে তাপমাত্রাও বেড়ে গেছে।
গ্রিনহাউস গ্যাস, সেটা আবার কি? এর ফলে তাপমাত্রাই বা বাড়ে কিভাবে?

আচ্ছা, তাহলে ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলি।
এই যে গ্যাসগুলো দেখছ, এরা হলো গ্রিনহাউস গ্যাস। এরা সূর্যের তাপ ধরে রেখেছে।
কার্বন ডাই অক্সাইড
মিথেন
নাইট্রাস অক্সাইড
এরা না থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা হতো -১৮° ডিগ্রি সেলসিয়াস।
তাহলে তো গ্যাসগুলো ভালো। পৃথিবীর তাপমাত্রা ঠিক রাখছে। কিন্তু এদের এতো ভয়ংকর দেখাচ্ছে কেন?
তার কারণ কলকারখানা, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, গাড়ির কালো ধোঁয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণ দিন দিন অনেক বেড়ে গেছে।

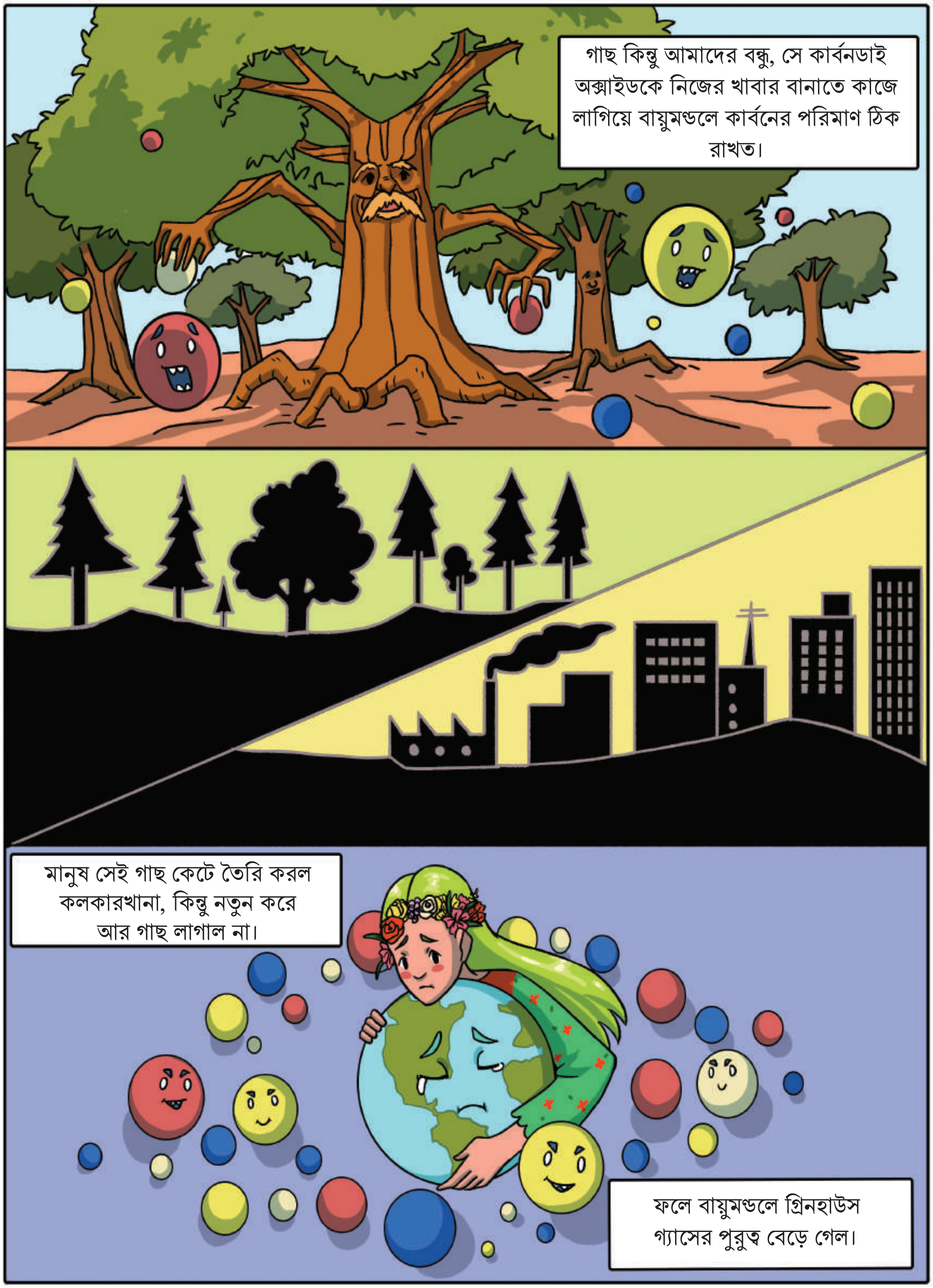
গাছ কিন্তু আমাদের বন্ধু, সে কার্বনডাই অক্সাইডকে নিজের খাবার বানাতে কাজে লাগিয়ে বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ ঠিক রাখত।
মানুষ সেই গাছ কেটে তৈরি করল কলকারখানা, কিন্তু নতুন করে আর গাছ লাগাল না।
ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পুরুত্ব বেড়ে গেল।

গ্রিনহাউস গ্যাস ঠিক কাচের মতো। কাচ যেমন তাপ ধরে রাখে, ওরাও তেমন তাপ ধরে রাখে। ওরা সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে বেশি বেশি তাপ ধরে রাখা শুরু করল। এরা সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসতে কোনো বাধা দেয় না, কিন্তু পৃথিবী থেকে তাপকে চলে যেতে বাধা দেয়। এ ঘটনাকে বলা হয় গ্রিনহাউস ইফেক্ট। আর এই গ্রিন হাউস গ্যাসের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তেই থাকল। আর এ অবস্থাকেই বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া।
আর এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে মেরুর সব বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে....... আর বদলে গেছে জলবায়ু।
CO2 +
CO2 +

এই যে উত্তর মেরু তুমি দেখলে, সেখানে এখন আর বরফ নেই। তার কারণ বরফ থাকার জন্যে যে তাপমাত্রা প্রয়োজন ছিল সেটা বদলে গেছে। এরকম আরও আবওহাওয়ার উপাদান যেমন, বৃষ্টিপাত যতটুকু হওয়ার দরকার ছিল, কোথাও তার থেকে কম হচ্ছে, তো কোথাও বেশি। ফলে যেখানে যতটুকু গাছপালা জন্মাবার কথা তা জন্মাচ্ছে না, আবার যেখানে গাছপালা থাকার কথা নয়, সেখানে গাছপালা জন্মাচ্ছে। চলো তোমাকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাই....
এটা কোথায়?
এটা সাহারা মরুভূমি
ও মা! এ দেখি অনেক অনেক গাছ। তার মানে মরুভূমির জলবায়ুও বদলে যাচ্ছে?
ঠিক তাই। চলো আবার আমাদের আগের জায়গায় ফিরে যাই।

এমা! দেখো মাছটা প্লাস্টিক ব্যাগ খেয়ে ফেলছে...কত ময়লা সমুদ্রে...পৃথিবী তো ময়লাতে ভরে গেছে...
Doctor's chamber
আর এভাবে পৃথিবীর সব কিছু বিষাক্ত হয়ে গেছে.... এতো দূষণের ফলে দেখো মানুষরা সব অসুস্থ হয়ে পড়েছে. আর মারাও যাচ্ছে..
প্রকৃতি তুমি পৃথিবীকে বাচাও প্লিজ...!
এখন তো আর কিছু করা যাবে না..কিন্তু এরকম অবস্থা যদি তোমরা না তৈরি করতে তাহলে তো পৃথিবী দূষিত হতো না....

না না না !! আমরা কিছুতেই পৃথিবীকে দূষিত হতে দেবো না..তুমি বলো কি করলে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে পারব! আমাদের কি করতে হবে..আমি তাই করব...আমি তোমাকে কথা দিলাম!
তাহলে শোনো
বেশি বেশি গাছ লাগাবে
জিনিসপত্র নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করবে না! যতটা সম্ভব জিনিসপত্র বারবার ব্যবহার করবে, রিসাইকেল করে ব্যবহার করবে।
ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র ব্যবহার না করলে বন্ধ রাখবে।
কোনো জিনিস অপচয় করবে না
ZERO WASTE
ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলবে।

এই যে ব্রতী আমরা তোমাকে খুঁজে হয়রান আর তুমি এখানে এসে ঘুমাচ্ছ! ....
আরে এই তো আমার মা, আমাদের ক্যাম্প... মা....
এই দেখো তোমার চমক!
ওয়াও কেক...
একি বাবা তুমি কেক খেয়ে প্যাকেটটা এখানে ফেললে কেন? এটা সমুদ্রে গিয়ে পড়লে তো মাছেরা খাবার ভেবে এটাই খাবে...
দুঃখিত আমি এখনই এটা সঠিক জায়গায় ফেলছি...

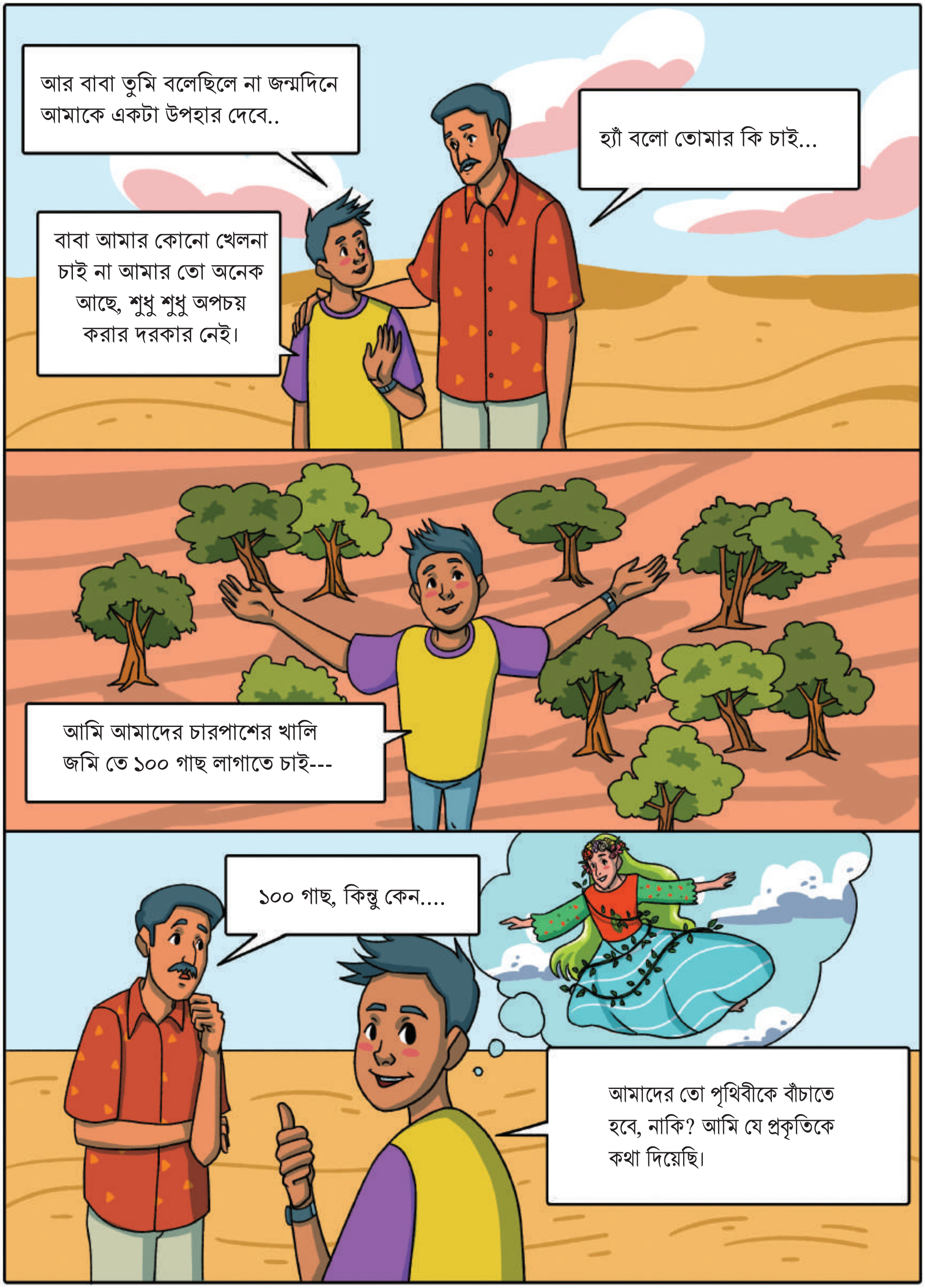
আর বাবা তুমি বলেছিলে না জন্মদিনে আমাকে একটা উপহার দেবে..
হ্যাঁ বলো তোমার কি চাই...
বাবা আমার কোনো খেলনা চাই না আমার তো অনেক আছে, শুধু শুধু অপচয় করার দরকার নেই।
আমি আমাদের চারপাশের খালি জমি তে ১০০ গাছ লাগাতে চাই---
১০০ গাছ, কিন্তু কেন....
আমাদের তো পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে, নাকি? আমি যে প্রকৃতিকে কথা দিয়েছি।

রনি বলল, ভালো, তবে সত্যিই যদি এভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস বেড়ে যায় তাহলে তো ভয়ংকর অবস্থা হবে।

মিলি বলল, শুধু কি তাই, পৃথিবীর দূষণও তো বেড়ে গেছে!

রিমি বলল, আপা কমিকসটা পড়ে তো অনেক কিছু জানতে পারলাম, কিন্তু পৃথিবীর জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছে।

খুশি আপা বললেন হ্যাঁ কমিকস থেকে পৃথিবী দূষিত হওয়ার অনেক কারণ আমরা দেখেছি। চলো এখন আমরা এসব বিষয়ে যা যা জানতে পেরেছি তা ছকে পূরণ করে ফেলি।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে পৃথিবী দূষিত হওয়ার কারণ এবং সেগুলো কেন হলো তা খুঁজে বের করে ছক পূরণ ও বিষয়গুলো ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করল–

দূষণ	গ্রিনহাউস ইফেক্ট	গ্লোবাল ওয়ার্মিং	জলবায়ু পরিবর্তন

কাজ শেষে মিলি বলল, খুব ভালো হলো যে আমরা পৃথিবীর জন্যে যা ভালো নয় তা চিহ্নিত করতে পেরেছি।

টিনা বলল, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে তো মেরু অঞ্চলের বরফ খুব দ্রুত গলে যাচ্ছে, তাহলে তো ওখানকার প্রাণীদের বেঁচে থাকা কষ্টের হয়ে পড়ছে।

সাকিব বলল, আমরা তো পরীক্ষা করে দেখেছিলাম যেখানে গাছ ছিল সেখানে বরফ গলতে বেশি সময় লেগেছিল।

মিলি বলল, তা তো ঠিক, কিন্তু আমরা মানুষরা তো দিন দিন কারণে অকারণে অনেক গাছ কেটে ফেলছি।

তাসনিম বলল, ইশ আমরা মানুষরা কেন যে এতো খারাপ কাজ করি!

খুশি আপা বললেন, কিন্তু মানুষরাই তো আবার ভালো কাজের মাধ্যমে পৃথিবীকে ভালো রাখতে পারি– নাকি! সবাই বলল ঠিক ঠিক। কারখানা তৈরির সময়ও পরিবেশের কথা মাথায় রাখতে হবে। আজকাল আমাদের দেশেও অনেক পরিবেশবান্ধব কারখানা তৈরি হচ্ছে।

প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তনে সামাজিক জীবনে প্রভাব

আজ খুশি আপা ক্লাসে আসার পরে সাকিব বলল, আপা আমরা তো দেখলাম মানুষের কারণে প্রকৃতির কত কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এভাবে যদি প্রকৃতির সব পাল্টে যেতে থাকে, তাহলে তো আমাদের জীবনেও তার বড়ো ধরনের প্রভাব পড়তে পারে— তাই না?

মিলি বলল, এ ব্যাপারটা তো আমরা 'শ্যামলী' গল্পেই দেখেছিলাম।

খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই, আচ্ছা চলো তো দেখি আরেকবার শ্যামলী গ্রামে প্রকৃতির কোন কোন পরিবর্তনে মানুষের জীবনে ঠিক কী কী প্রভাব পড়েছিল।

তখন তারা দলে ভাগ হয়ে পরিবর্তনের প্রভাবগুলো খুঁজে বের করল।

এরপর খুশি আপা বললেন, আমরা তো সবাই নদী দেখেছি তাই না? আচ্ছা নদীর ধারে কী কী থাকতে দেখেছ তোমরা?

অভি বলল, আপা আমার মামার বাড়ির পাশে একটা নদী আছে, সেই নদীর ধারে ধানের জমি ছিল, আবার কিছু দূরে কয়েকটা বাড়িও ছিল।

তাসনিম বলল, আপা আমরা ছুটিতে গ্রামে গিয়েছিলাম বেড়াতে। ওখানে নদীর পাশে কৃষিজমি এবং তার একটু পাশে একটা ইটভাটা দেখেছি।

খুশি আপা বললেন, আচ্ছা তোমাদের দেখা নদীর ধারণা তো পেলাম। এখন যদি বলি তোমাকে একটা নদী বানাতে হবে যার চারপাশে তোমরা তোমাদের ইচ্ছেমতো ফসলের জমি, শহর, কারখানা, ঘর-বাড়ি প্রভৃতি স্থান বসাতে পারবে, তাহলে কেমন হবে বলোতো?

সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

রিভার পাজল তৈরির নিয়ম

খুশি আপা তখন তাদের ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে যেতে বললেন। তারপর বললেন, সবার বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট-৪ অংশে রিভার পাজল সংযুক্ত আছে। সেখান থেকে কাঁচি দিয়ে পাজল এর পৃষ্ঠা দুটি কেটে আলাদা করে নেবে। তারপর ছবিতে যে চারকোনা বাক্সের ভিতরে টুকরো টুকরো ছবি রয়েছে, সেই ছবিগুলো কেটে ছবিগুলো আলাদা করে ফেল। তারপর তিনি, প্রতিটি দলকে 'উৎস' অংশটি একটি নদীর শুরুতে, অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত ছক পেপারের সবচেয়ে উপরের দিকে এবং 'মুখ' অংশটি, যেটি নদীর শেষ, তা ছক পেপারের নিচের দিকে রাখতে বললেন।

তখন প্রতিটি দল একটি করে নদীর গতিপথ বানাল। বানানো শেষ হলে টেপ দিয়ে ছক পেপারে নদীটিকে আটকে দিলো এবং পাশে লিখল নদীর পাশে তারা কী কী জিনিস/স্থানের অবস্থান চিহ্নিত করেছে।

চলো আমরাও ওদের মতো করে দলে ভাগ হয়ে
পাজলের সাহায্যে আমাদের নদী বানাই।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব

খুশি আপা প্রত্যেকের নদী দেখে হাততালি দিয়ে ওদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে খুব সুন্দর নদী বানিয়েছ। এখন ভাবো তো এখানে যদি নদীটি না থাকে, নদীর গতিপথের কোনো পরিবর্তন হয়, নদীর পাড় ভাঙা শুরু হয় তাহলে কেমন হবে?

সবাই তো খুব চিন্তায় পড়ে গেল!

তখন খুশি আপা তাদের কিছু ছবি দেখালেন।

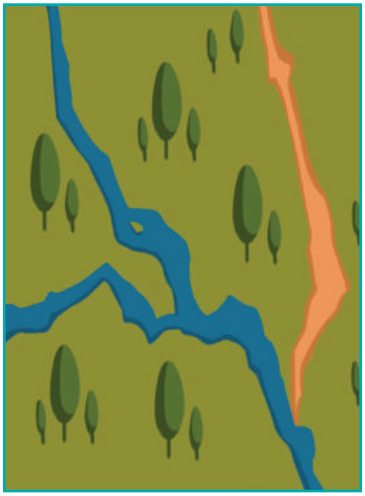

নদীগুলোর এরকম হবার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছ কি?

ফাতেমা বলল, আপা নদী যদি চলার পথে কোনো বাধা পায়, তাহলে তার গতিপথ পাল্টে ফেলতে পারে।

সাকিব বলল, হ্যাঁ যদি নদীতে বাঁধ দিই। আমরা তো আমাদের বানানো নদীতে একটা বাঁধ দিয়েছিলাম— আহা কি যে ভুল হয়ে গেল।

খুশি আপা বললেন, না সাকিব তুমি ভুল করোনি, আমরা আমাদের প্রয়োজনে অনেক সময় নদীতে বাঁধ দিই, কিন্তু সেটার পরিকল্পনা সঠিকভাবে করতে হবে।

রনি বলল, আপা নদীটি যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে তো আশপাশের কৃষিকাজের পানির সমস্যা হবে।

খুশি আপা বললেন, শুধু কি তাই! আচ্ছা চলো, তাহলে আমরা খুঁজে বের করি নদীর পরিবর্তনের ফলে কী কী প্রভাব পড়তে পারে। তখন তারা দলগতভাবে ছক আকারে নদীভাঙন, নদীর শুকিয়ে যাওয়া এবং গতিপথ পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব অনুসন্ধান করে বের করল।

নদীর অবস্থা	কারণ	সামাজিক জীবনে প্রভাব
নদীভাঙন	১. ২. ৩. ৪.	১. ২. ৩. ৪.
নদীর শুকিয়ে যাওয়া	১. ২. ৩. ৪.	১. ২. ৩. ৪.
গতিপথ পরিবর্তন	১. ২. ৩. ৪.	১. ২. ৩. ৪.

চলো, আমরাও ওদের মতো করে দলে ভাগ হয়ে নদীর পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব ছকে পূরণ করি।

প্রাচীন মানুষের জীবনে নদীর প্রভাব

আজ ক্লাসের শুরুতে ওমেরা বলল, আপা কাল বাসায় গিয়ে যখন আমাদের নদী নিয়ে অনুসন্ধানের কথা বলছিলাম, তখন আমাদের সাহায্যকর্মী খালা বলল, তার জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

খালা বলল, তাদের বাড়ি ছিল যমুনা নদীর পাড়ের একটি গ্রামে। তাদের বাড়ির একটু দূরে ছিল যমুনা নদী। তাদের পুকুর ভরা মাছ ছিল, অনেক ধানের জমি ছিল। তাদের অনেক ধান হতো, ফসলের জমিতে নানা ধরনের ফসল হতো। খালা বলল যে, নদীর ধারের জমি নাকি অনেক উর্বর হয়। অনেক ভালো কৃষিকাজ করা যায় এধরনের জমিতে। কিন্তু নদীভাঙনে তাদের আজ আর ঘরবাড়ি জমি পুকুর কিছুই নেই। তার বর এখন শহরে রিকশা চালায় আর সে আমাদের বাসায় সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করছে। জানেন আপা, খালা কথাগুলো বলতে বলতে কান্না করছিল। আমার খুব খারাপ লাগছিল।

খুশি আপা বললেন, আহারে আমাদেরও সবার খুব খারাপ লাগছে তোমার খালার জীবনের কথা শুনে। তোমরা জানো এরকম ঘটনা কিন্তু শুধু ওমেরার খালার জীবনে ঘটেছে তাই নয়, এরকম বহু মানুষ আছে যাদের জীবনের কাহিনি ওমেরার খালার সঙ্গে মিলে যাবে।

শিহান বলল, আচ্ছা প্রাচীনকালে তো এখনকার চেয়েও অনেক বড়ো বড়ো নদী ছিল। আর প্রাচীনকালে যেহেতু নদীপথই ছিল যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম, তাই নিশ্চয় সেখানের মানুষের জীবনেও নদীর অনেক প্রভাব ছিল– তাই না?

সাকিব বলল, হ্যাঁ আমাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ইতিহাস অংশ থেকে জেনেছি যে, মিশরীয় সভ্যতা নীলনদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

রনি বলল, চলো তাহলে আমরা অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করি প্রাচীন মানুষের নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার ইতিহাস।

খুশি আপা বললেন, বেশ বেশ এমন অনুসন্ধানী মনই তো চাই।

টিংকু বলল, আমরা আমাদের লাইব্রেরিতে দেখতে পারি এ সম্পর্কিত কোনো বই আছে কিনা।

খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ তোমরা এ কাজটি করার জন্য ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ইতিহাস অংশ, শিক্ষকের সাহায্য নিতে পার আবার বড়োদের সাহায্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করতে পার।

ওরা তখন দলগত আলোচনা ও বইয়ের সাহায্যে প্রাচীন মানুষের নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করে পৃথিবীর মানচিত্রে তা উপস্থাপন করল এবং সেসকল সভ্যতার দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লিখল যা নদীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

চলো আমরাও ওদের মতো করে প্রাচীন মানুষের নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করে পৃথিবীর মানচিত্রে তা চিহ্নিত করি এবং সেসব সভ্যতার ২টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লিখি যা নদী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

খুশি আপা তাদের কাজের জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানালেন।

মিলি বলল, আমরা দেখলাম যখন উপযুক্ত পরিবেশের অভাব হয়েছে তখনই প্রাচীন সভ্যতাগুলো সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু সভ্যতা বিলীনও হয়ে গেছে।

রনি বলল, প্রাচীনকালে মানুষ ছিল কম এবং বসবাসের জায়গা ছিল অনেক, আবার তাদের স্থানান্তরিত হতে কোনো অনুমতি, যেমন পাসপোর্ট বা ভিসার প্রয়োজন ছিল না, তাই তো তারা নিজেদের পছন্দমতো জায়গা খোঁজার পথ পেয়েছিল। কিন্তু এখন তো পৃথিবীতে মানুষের তুলনায় বসবাসযোগ্য জায়গার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। আবার আমরা ইচ্ছেমতো কোনো জায়গায় গিয়ে বসবাসও করতে পারব না। তাহলে এখন যদি আমরা নিজেদের বসবাসের জায়গা দূষিত করে ফেলি, তাহলে কী হবে?

সাকিব বলল, তাহলে তো আমাদেরও বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের বসবাসের জায়গা ভালো রাখতে চেষ্টা করি, তাহলে তো দুশ্চিন্তা কিছুটা কমানো যেতে পারে, তাই না?

খুশি আপা বললেন, এই তো বিবেচক মানুষের মতো কথা। প্রকৃতির যেকোনো কাঠামো যদি পরিবর্তন হয় তার প্রভাব আমাদের সামাজিক জীবনে অবশ্যই পড়বে। তবে এসব কাজ করতে গেলে বড়োদের একটু সাহায্য লাগবে।

গণেশ বলল, আপা আমাদের প্রায় সবার বাসায় বা আমাদের এলাকায়ও তো অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন, যারা এধরনের কাজে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

মিলি বলল, আর যেহেতু আমরা প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে অনুসন্ধান করছি, তাই এলাকার বয়স্ক মানুষদেরই এ কাজে আনা ভালো হবে, কারণ তাদের অভিজ্ঞতাও সবার থেকে বেশি। সবাই তাকে সমর্থন জানাল।

খুশি আপা বললেন, বাহ্, তাহলে তো খুবই ভালো হয়। তাহলে তোমরা আলোচনা করে বের করো নিজের এলাকাকে ভালো রাখার মতো কোন কোন কাজ তোমরা করতে চাও। এই কাজটি আমরা সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে করব। তারা দলগত আলোচনা করে কয়েকটি কাজের তালিকা বানাল, যা তারা এলাকার বয়স্ক মানুষদের সাহায্য নিয়ে করতে চায়।

এলাকাকে ভালো রাখার কাজের তালিকা
১. এলাকার রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা
২. এলাকায় ডাস্টবিনের ব্যবহারে মানুষকে সচেতন করা
৩.
৪.
৫.

চলো, আমরাও ওদের মতো করে আমাদের এলাকা ভালো রাখার কিছু কাজের তালিকা তৈরি করি। যা এলাকার প্রবীণ মানুষের সহায়তায় করতে পারি।

সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করল ওরা এমন কোনো কাজ করবে না যাতে ভবিষ্যতে আমাদের পৃথিবী আমাদেরই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ওরা শুরু করবে এলাকার ছোটো ছোটো কাজ দিয়ে, একদিন এমন ছোটো ছোটো কাজ একত্র হয়ে পুরো পৃথিবীকে ভালো রাখার জন্য ভূমিকা রাখবে।

সমাজ ও সম্পদের কথা

ক্লাসের শুরুতেই খুশি আপা সবার খোঁজখবর নিলেন। তারপর বললেন, চলো আজও কিছু ছবি নিয়ে কাজ শুরু করি। এসো সবাই মিলে নিচের ছবিগুলো দেখি এবং বোঝার চেষ্টা করি।

পানি

প্রাকৃতিক গ্যাস

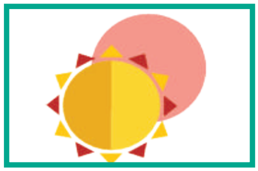
সূর্যের আলো

হাতুড়ি

টাকা

গাছপালা

কয়লা

কৃষক

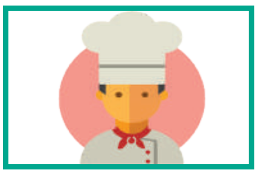
বাবুর্চি

যাত্রীবাহী বাস

শিক্ষক

ট্রাক্টর

সবার ছবি দেখা শেষ হলে খুশি আপা বললেন, এবার বলো উপরের এই ছবিগুলোকে একসঙ্গে আমরা কি বলতে পারি?

আয়েশা: ছবিতে দেখানো মানুষ আর অন্য সবই আমাদের কোনো না কোনো ভাবে কাজে লাগে!

আনুই: এই মানুষগুলোর শ্রম, অন্যান্য উপকরণ এবং বাকি জিনিসগুলো ব্যবহার করে আমরা অনেক কিছু বানাতে পারি।

দীপঙ্কর: এগুলো ব্যবহার করে আমরা অনেক সেবা পেয়ে থাকি!

খুশি আপা বললেন, বাহ্! তোমরা দেখি এদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোই বলে দিলে। ঠিকই বলেছ তোমরা। এদের সবারই এই বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে। আর এজন্যই এদেরকে এক কথায় আমরা সম্পদ বলে থাকি। আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছুই দেখি না কেন, সবই আমাদের সম্পদ। কেননা,

> কোনো জিনিস তৈরি করতে বা কোনো সেবা দেওয়ার জন্য যা কিছুই মানুষ ও প্রকৃতির কাজে লাগে তা-ই সম্পদ।

এবার চলো, আমরা দলে বিভক্ত হয়ে যে ছবিগুলো দেখলাম সেগুলোর ধরন অনুযায়ী আলাদা করে নিচের টেবিলের তিনটি কলামে বিভক্ত করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

তারপর সবাই যার যার দলে বিভক্ত হয়ে ছবিগুলো থেকে একই ধরনের সম্পদগুলো আলাদা আলাদা কলামে নতুন করে সাজাল। সবগুলো দল উপস্থাপন করার পর, সবার সাজানো একসঙ্গে মিলিয়ে নিচের টেবিলের মতো চেহারা দাঁড়াল।

পানি	কৃষক	হাতুড়ি
গাছপালা	বাবুর্চি	ট্রাক্টর
কয়লা	শিক্ষক	যাত্রীবাহী বাস

খুশি আপা খুব আনন্দিত হলেন সবার কাজ দেখে। বললেন, খেয়াল করে দেখ আমরা ছবির সম্পদগুলোকে তিনটি ধরন অনুযায়ী তিনটি ভাগেই ভাগ করতে পেরেছি। প্রথম কলামে আমরা পেয়েছি পানি, গাছপালা, কয়লা। কেউ কি বলতে পার, এদের মাঝে মিলের জায়গাটি কোথায়?

আয়েশা বলল, এগুলো সবই সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায়, কোনো মানুষই এগুলো তৈরি করে নি।

যে সম্পদ কোনো মানুষ তৈরি করে না বরং সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন– পানি, বাতাস, সূর্যের আলো, তামা, লোহা প্রভৃতি।

আচ্ছা তোমরা কী আরও কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের নাম বলতে পার? তখন সবাই চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ খুঁজে বের করল।

চলো আমরাও ওদের মতো করে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ খুঁজে বের করি এবং নিচের ছকটি পূরণ করি

ক্রম	প্রাকৃতিক সম্পদের নাম	কোথায় পাওয়া যায়
১		
২		
৩		

মিলি বলল, দ্বিতীয় কলামে আমরা পেয়েছি, কৃষক, বাবুর্চি এবং শিক্ষক। এরা সকলেই মানুষ। সমাজের মানুষকে কোনো না কোনো সেবা দিয়ে থাকেন। তাই এরা সবাই একই কলামে স্থান পেয়েছেন। এরা সবাই মানবসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণত যারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি বা উৎপাদন করে বা সেবা প্রদান করে তারা মানবসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর সবাই মিলে মানবসম্পদের আরও কিছু উদাহরণ খুঁজে বের করল।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চলো আমরাও ওদের মতো করে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানবসম্পদের উদাহরণ খুঁজে বের করি ও নিচের ছক পূরণ করি।

ক্রম	মানবসম্পদের নাম	কী সেবা পাওয়া যায়
১		
২		
৩		

সুভাষ এবার তৃতীয় কলামের কথা বলতে গিয়ে দেখাল যে সেখানে জায়গা পেয়েছে হাতুড়ি, ট্রাক্টর আর যাত্রীবাহী বাস। সুভাষ বলল, এগুলো মানুষ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে বা সেবা প্রদান করার জন্য ব্যবহার করে থাকে।

খুশি আপা বললেন, এ ধরনের সম্পদকে সাধারণত রূপান্তরিত সম্পদ বলা হয়। তাহলে এবার রূপান্তরিত সম্পদের আরও কিছু উদাহরণ আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। সবাই মিলে রূপান্তরিত সম্পদের আরও কিছু উদাহরণ বের করল।

সাধারণত মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে, জিনিস তৈরিতে ও সেবা প্রদান করার জন্য যে সকল জিনিস/দ্রব্য, যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার ব্যবহার করে, তাদের রূপান্তরিত সম্পদ বলা হয়।

রূপান্তরিত সম্পদের উদাহরণ খুঁজে বের করি ও নিচের সারণি পূরণ করি।

ক্রম	রূপান্তরিত সম্পদের নাম	কী সেবা পাওয়া যায়
১		
২		
৩		

এরপর ওরা মজার একটি খেলা খেলল। খুশি আপা আগে থেকেই তৈরি করা একটি তালিকা বের করে বললেন এই তালিকাটিতে ২০টি সম্পদের নাম আছে। তোমরা প্রথমে এককেটি দলে ছয় জন করে ভাগ হয়ে যাও। সবাই উৎসাহের সাথে নিয়ম মেনে দলে বিভক্ত হয়ে গেল। তখন খুশি আপা বললেন, আগে খেলার নিয়মগুলো সবাই ভালো করে শোনো।

- আমি প্রতিবার একটি করে সম্পদের নাম বলব,
- যে দল সম্পদটি কোন ধরনের অর্থাৎ প্রাকৃতিক না রূপান্তরিত না মানবসম্পদ সেটা নিশ্চিতভাবে জানে, তারা হাত তুলবে,
- যে দল আগে হাত তুলবে, তারা উত্তর দেবার সুযোগ পাবে। যদি তারা সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ৫ নম্বর করে পাবে,

- আর যদি ভুল উত্তর দেয়, তাহলে দ্বিতীয় যে দল হাত তুলেছে সে দল বলার সুযোগ পাবে, যদি তারাও না পারে তাহলে তার পরের দল সুযোগ পাবে। যদি কোনো দলই না পারে তাহলে সে নামটি বাদ দিয়ে পরবর্তী নাম নিয়ে আবার খেলা শুরু হবে। আর খেলা শেষে যেসব সম্পদের ধরন কেউ বলতে পারনি আমি তা বলে দেবো,
- যেসব সম্পদের নাম নিয়ে খেলা হবে তার সঠিক ধরন অনুযায়ী তোমরা প্রতিটি দল নিচের সারণিতে নামগুলো লিখবে। যে সব সম্পদের সঠিক উত্তর দিতে পারবে সে সব সম্পদের পাশে নম্বরের ঘরে নম্বর বসাবে ও আমার কাছে জমা দেবে,
- যে দল সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবে, তারা বিজয়ী হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ	রূপান্তরিত সম্পদ	মানবসম্পদ	প্রাপ্ত নম্বর
		মোট=	

তারপর খুশি আপা বললেন, আচ্ছা চলো প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকাটা আবার দেখি। আচ্ছা বলোতো, এই তালিকায় সব প্রাকৃতিক সম্পদই কি একই রকম? না তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে?

সবাই চুপ!

খুশি আপা বললেন, আচ্ছা তোমাদের আরও একটু চিন্তার খোরাক দিচ্ছি! ভেবে দেখ তো ব্যবহার করার পর এগুলোর সবই কি একই পরিণতি লাভ করে? নাকি একেকটির পরিণতি একেক রকম হয়?

সবার আগে নন্দিনী হাত তুলে বলল, আমি জানি, পার্থক্য আছে! যেমন, পানি, বাতাস, সূর্যের আলো এরকম প্রাকৃতিক সম্পদগুলো ব্যবহার করলেও শেষ হয় না! প্রকৃতি আবার এগুলো তৈরি করে। কিন্তু কয়লা, লোহা, স্বর্ণ, জ্বালানি তেল এগুলো একবার ব্যবহার করলে চিরতরে শেষ হয়ে যায়। প্রকৃতি আর তাদের ফিরিয়ে আনে না!

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ। পৃথিবীর সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেই আসলে এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

> যে সম্পদগুলো বহু ব্যবহার করলেও শেষ হয় না বা কোনো একজন ব্যবহারকারী মানুষের জীবদ্দশাতেই প্রকৃতি আবার তাদের তৈরি করে, এগুলোর পরিমাণ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে, সেগুলোকে বলে নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন: বাতাস, সূর্যের আলো প্রভৃতি।

তারপর বললেন, এখন খুব সহজেই তোমরা অনুমান করতে পারছ যে, অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যেগুলো একবার ব্যবহার করলে চিরতরে ফুরিয়ে যায়, প্রকৃতি সাধারণত আবার তাদের তৈরি করতে পারে না, সেসব প্রাকৃতিক সম্পদকে অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলে । যেমন: কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, জ্বালানি তেল, স্বর্ণ, তামা প্রভৃতি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

তবে একটা বিষয় আমরা মনে রাখব–

কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যা সাধারণভাবে দেখলে মনে হতে পারে নবায়নযোগ্য কিন্তু আসলে নবায়নযোগ্য নয়। কারণ একবার ব্যবহারের পর প্রকৃতি আর তা তৈরি করতে পারে না। তবে মাটির নিচে যে পানির মজুদ আছে তা পুনরায় মজুদ করতে পারলেও একজন মানুষের জীবদ্দশাতেই আগের অবস্থায় ফিরে আসে না। নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ যদি এমন মাত্রায় ব্যবহার করা হয় যে তা পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে যেতে অনেক দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয় তখন ঐ প্রাকৃতিক সম্পদ অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদে পরিণত হয়। যেমন– পানি, গাছপালা ইত্যাদি।

খুশি আপা, আচ্ছা তাহলে এখন আমরা সবাই জানলাম যে, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, যা কিছু আমরা ব্যবহার করি, তার সবই আমাদের সম্পদ– হয় প্রাকৃতিক, না হয় রূপান্তরিত অথবা মানবসম্পদ।

বাজার, দ্রব্য, পণ্য

এবার বলোতো! তোমাদের মাঝে কে কে বাজারে গিয়েছ?

দেখা গেল ক্লাসের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই কোনো না কোনো সময় বাজারে গিয়েছে। খুশি আপা বললেন, খুব ভালো! আর যাদের এখনো বাজারে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, তারা অবশ্যই পরিবারের কারও সঙ্গে বাজারে ঘুরে আসবে। আচ্ছা, এবার বলো তো, বাজারে বা দোকানে কী হয়?

নাসির বলল, অনেক জিনিস সাজানো থাকে বিক্রির জন্য। আর মানুষ বা ক্রেতারা এসে টাকার বিনিময়ে সেসব জিনিস কিনে নিয়ে যায়।

খুশি আপা, ভালো বলেছ। তাহলে এবার বলো তো সশরীরে বাজারে যাওয়া ছাড়াই বাড়িতে বসে থেকে কি কোথাও থেকে বিভিন্ন জিনিস কিনতে পাওয়া যায়? আয়েশা বলল, যায় বৈকি! এই তো সেদিন আমার কাকা অনলাইনে ঘরে বসেই শার্ট কিনল!

ঠিকই বলেছ, তাহলে জিনিস কেনাবেচার জন্য বা বাজারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট জায়গার প্রয়োজন হয় না। ক্রেতা থাকলেই যে কোনো জায়গা থেকে কেনাবেচা হতে পারে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই নিজ নিজ ঘরে থেকেই কেনাবেচার কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। এ জন্যই অর্থনীতির ভাষায়–

কোনো স্থানে কোনো জিনিস কেনার মতো টাকা আছে এমন ক্রেতার সংখ্যাকে
ঐ স্থানে ঐ জিনিসের বাজার বলে।

আচ্ছা এই সুযোগে তোমাদের মজার একটা বিষয় জানিয়ে রাখি। বাজারে যেসব জিনিস বা দ্রব্য বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়, তাকে বলা হয় পণ্য। কাজেই আমরা বাজারে, দোকানে, অনলাইনে যেখানেই হোক না কেন, বিক্রির জন্য যেসব জিনিস বা দ্রব্য দেখি, তা-ই পণ্য। আর মানুষ যখন কোনো কিছু নিজে ব্যবহার করার জন্য উৎপাদন করে তাকে দ্রব্য বলে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হতে পারে। ধরো একজন কৃষক যখন নিজে খাওয়ার জন্য চাল উৎপাদন করে, তখন সেই চাল একটি দ্রব্য। কিন্তু কৃষক যখন বিক্রির উদ্দেশ্যে চাল উৎপাদন করে বা তার উৎপাদিত চাল বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে যায়, তখন তাকে বলে পণ্য।

চিত্র: পণ্য

অন্যদিকে, মানুষ যখন অন্য মানুষের জন্য বিভিন্ন কাজ করে দেয়, তখন সেসব কাজকে সেবা বলা হয়। সেবা অর্থের বিনিময়েও হতে পারে। মা যখন ঘরে আমাদের খাবার তৈরির জন্য রান্না করেন, সেটা একটি সেবা। কিন্তু রেস্টুরেন্টে যখন বাবুর্চি খাবার তৈরি করার জন্য রান্না করেন সেটা সেবা হলেও তিনি অর্থের বিনিময়ে সেবা বিক্রি করেন। এখানে সবাই একটা বিষয় খেয়াল করো, মা সারা দিনে যেসব কাজ করেন, তার সবই সেবা। কিন্তু তিনি আমাদের কাছ থেকে এসব সেবার জন্য কোনো অর্থ বা টাকা গ্রহণ করেন না। এভাবে বাবাও বিনামূল্যে সেবা দেন আমাদের। এমনকি নানি, দাদি, চাচা, চাচি বা ঘনিষ্ঠ অনেকেই আমাদের সেবা দিয়ে থাকেন, যার বিনিময়ে তাঁরা কিছু নেন না। কারণ, তাঁরা আমাদের ভালোবাসেন। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ প্রতিদিন বিশেষভাবে আমাদের মায়েরা যেসব সেবা দিয়ে থাকেন, তা যদি অর্থমূল্যে রূপান্তর করা হয় তাহলে টাকার পরিমাণ কী হতে পারে?

চিত্র: সেবা

এবার খুশি আপা একটু থেমে বললেন, এখন বলো তো যে পোশাক পরে এসেছ সেটা কি দ্রব্য না পণ্য?

আনাই মোগিনি সবার আগে হাত তুলে বলল, আমাদের পোশাক একটি দ্রব্য! কারণ আমরা এগুলো বিক্রি করছি না, নিজেরা ব্যবহার করছি। কিন্তু আমরা এগুলো কেনার সময় এগুলো যখন দোকানে ছিল, তখন এগুলো ছিল পণ্য।

খুশি আপা ভীষণ আনন্দিত হয়ে বললেন, খুব সুন্দর হয়েছে তোমার উত্তর। এরপর সবাই খুশি আপার সঙ্গে চারপাশের বিভিন্ন জিনিস থেকে কিছু জিনিস বাছাই করে তার মধ্যে কোনটি দ্রব্য, কোনটি সেবা আর কোনটি পণ্য তা আলাদা করে শনাক্ত করার খেলা খেলল।

চলো আমরাও নিচের সারণি ব্যবহার করে চারপাশের বিভিন্ন জিনিসের তালিকা তৈরি করে সেগুলোর মধ্যে থেকে উপযুক্ত ঘরে কোনটি সেবা, কোনটি পণ্য আর কোনটি দ্রব্য তা আলাদা করি।

ক্রম	জিনিসের নাম	দ্রব্য	পণ্য	সেবা
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				

এরপর খুশি আপা বললেন, আচ্ছা এবার চলো আমরা আরেকটি কাজ করি! চলো আমরা আবারো দলে বসে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত কী কী দ্রব্য ও পণ্য ব্যবহার করি এবং এগুলো কোথায় তৈরি হয় তার একটা আনুমানিক তালিকা তৈরি করি!

তখন সবাই নিচের সারণি ব্যবহার করে তালিকাটি তৈরি করল

ক্রম	পণ্য/দ্রব্যের নাম	কোথায় তৈরি হয়
১	বিস্কুট	কারখানা
২	ডিম	মুরগির খামার
৩		
৪		
৫		

তারপর প্রতিটি দল যার যার তালিকা উপস্থাপন করল।

চলো আমরাও উপরের সারণির মতো সারণি তৈরি করে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত পণ্য/দ্রব্য ও সেগুলো কোথায় তৈরি হয় তার একটি তালিকা তৈরি করি।

উপস্থাপন শেষে খুশি আপা বললেন, দেখেছ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য অনেক পণ্য বা দ্রব্যই কারখানায় তৈরি হয়। তোমরা কি কখনো কোনো কারখানার ভেতরে গিয়ে কীভাবে সেখানে পণ্য বা দ্রব্য তৈরি হয় তা দেখেছ? কেমন হয় যদি আমরা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আমাদের কাছাকাছি কোনো একটি কারখানা পরিদর্শন করি?

সবাই সমস্বরে উল্লসিত স্বরে বলল– খুবই ভালো হয়!!

খুশি আপা তখন বললেন, ঠিক আছে তাহলে আগামী ক্লাসে প্রস্তুত হয়ে এসো, আমরা কারখানা পরিদর্শনে যাব। এরপর প্রস্তুতির জন্য খুশি আপা সবাইকে নিচে উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দিলেন।

- সবার বাবা-মা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য একটি অনুমতিপত্র
- কী কী করণীয় তার তালিকা
- নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা

কারখানা পরিদর্শন

আজ ক্লাসে খুশি আপা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত আছেন। অভিভাবকদের মধ্যে যাদের আজ তেমন কোনো ব্যস্ততা নেই, তারাও এসেছেন। গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরেই প্রস্তুতি চলছিল আজকের এই দিনটি সফল করার জন্য। এতো আয়োজনের মূল কারণ হচ্ছে, আজ ষষ্ঠ শ্রেণির সবাই কারখানা পরিদর্শনে যাবে। যদিও সবার ইচ্ছা ছিল বড়ো কোনো একটা আইসক্রিম কারখানা পরিদর্শনে যাবার কিন্তু স্কুলের আশপাশে কোনো আইসক্রিম কারখানা নেই। যাতায়াতের খরচ, সময়, দূরত্ব, নিরাপত্তা এসব দিক বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুলের পাশেই যে ইটভাটা আছে, সেখানেই তারা পরিদর্শনে যাবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

খুশি আপা এক সপ্তাহ আগেই ক্লাসে এসে সবার সঙ্গে আলাপ করে যার যার এলাকা অনুযায়ী দলে ভাগ হতে সাহায্য করেছেন। আপার সহযোগিতায় সবাই যার যার এলাকা অনুযায়ী দলে বিভক্ত হয়েছে। তাঁর সহযোগিতায় তারা ছোটো একটা কারখানা পরিদর্শনের প্রস্তুতি দল তৈরি করেছে। এ ছাড়াও খুশি আপা প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে কয়েকজন বিষয় শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদেরও সঙ্গে নিয়েছেন। এদিকে অনুমতিসাপেক্ষে অনেক অভিভাবকও সঙ্গী হতে চেয়েছেন।

নির্দিষ্ট সময়ে সবাই ইটের ভাটায় পৌঁছে গেল। ইটভাটা নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য ওরা আগে থেকেই এ বিষয়ে-

- অনুসন্ধানের প্রশ্ন
- অনুসন্ধানের পরিকল্পনা
- তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা
- তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা ইত্যাদি তৈরি করে রেখেছিল।

এ কাজে তারা ‘বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি’ অধ্যায়ের সহযোগিতা নিয়েছিল।

অনুসন্ধানের প্রশ্ন

আমাদের চারপাশে যে সকল জিনিস দেখি সেগুলো কোথায় ও কীভাবে তৈরি করা হয় এবং পরিবেশের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক কেমন?

তথ্য সংগ্রহ (পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার)

কারখানায় কীভাবে বিভিন্ন জিনিস তৈরি হয় এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাব অনুসন্ধানের জন্য কিছু প্রশ্ন তৈরি করল।

> চলো আমরাও কারখানায় কীভাবে বিভিন্ন জিনিস তৈরি হয় এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাব অনুসন্ধানের জন্য কিছু প্রশ্ন তৈরি করি।

এরপর খুশি আপা তাদের বললেন, আচ্ছা বর্তমান সময়ে মানুষ কীভাবে উৎপাদন করে তা তো আমরা দেখলাম। অতীতেও কি মানুষ একইভাবে উৎপাদন করত?

এ প্রশ্ন শুনে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল, কিন্তু কেউই কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। সবাই নিশ্চুপ হয়ে থাকল।

তখন নন্দিনী বলল, মনে হয় আমরা আসলে কেউই এ বিষয়ে কিছু জানি না। কিন্তু বিষয়টা খুবই মজার হবে বলে মনে হচ্ছে। আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এসেছে। আমরা যদি এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী কাজ করতে পারি, তাহলে কেমন হয়? সবাই সমস্বরে বলে উঠল, খুব মজা হবে।

খুশি আপা বললেন, খুব ভালো লাগল তোমাদের কথা শুনে। তোমরা এখন নিজে থেকেই বিভিন্ন বিষয় শেখার চেষ্টা করছ। ঠিক আছে চলো আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধানী কার্যক্রম পরিচালনা করি। তাহলে চলো দলে বিভক্ত হয়ে আমরা অতীতে উৎপাদন কীভাবে হতো বা এক কথায় অতীতের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে কী জানতে চাই সে বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রশ্ন তৈরি করি।

তখন সবাই দলে বিভক্ত হয়ে নিচের মতো করে অতীতের উৎপাদন পদ্ধতি জানার জন্য অনুসন্ধানের প্রশ্ন তৈরি করল।

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন

অতীতে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন জায়গায় কীভাবে উৎপাদন বা খাবার/দ্রব্য/পণ্য তৈরি করা হতো এবং ঐ সময়ের মানুষ কীভাবে এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল?

এরপরে খুশি আপা একটা বিষয়ে সবাইকে সচেতন করে দিলেন। এভাবে অতীত বলতে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ধরো পঞ্চাশ-একশো বছর আগেকার কথা বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে হয়ত বই ইন্টারনেট ছাড়াও পরিবারের বয়স্ক আত্মীয় স্বজনরা অনেক ধারণা দিতে পারবেন।

এরপর সব কয়টি দল অনুসন্ধানের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তথ্য সংগ্রহের উপযোগী প্রশ্নমালা তৈরি করে উপস্থাপন করল।

চলো আমরাও ওদের মতো প্রশ্ন তৈরি করে অতীতের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধানী কাজ তৈরি করি।

প্রশ্নমালা তৈরি করার পর আনাই মোগিনি বলল, কিন্ত আমরা তো অতীতে ফিরে যেতে পারব না, তাহলে অতীতের মানুষের জীবন নিয়ে কীভাবে গবেষণা করব?

শুনে খুশি আপা বললেন, অতীতে মানুষ যা করেছে তা ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি। আমাদের যে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই আছে সেখানে মানুষের অতীতের কাজের অনেক বিবরণ আমরা খুঁজে পাই। আমরা এই বইসহ অন্যান্য বই, পত্রিকা বা ইন্টারনেটসহ যেকোনো নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যবহার করতে পারব। তাছাড়া পরিবারের বয়স্ক জনদের কাছ থেকেও অনেক তথ্য পেতে পারি।

এরপর দলগতভাবে ওরা উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে অতীতের বিভিন্ন সময়ে মানুষ কীভাবে উৎপাদন করত সে বিষয়ে অনুসন্ধান করল। খুশি আপার সহযোগিতায় তারা বিভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের উৎপাদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারল।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এ কাজে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের সঙ্গে ওরা অন্যান্য বই এবং ইন্টারনেট ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করেছে। ইন্টারনেট থেকে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় সেটা ওরা আগেই ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয় থেকে শিখে নিয়েছিল। তার অনেক তথ্য পেয়েছে পরিবারের বয়স্ক জনের কাছ থেকে।

চলো আমরাও ওদের মতো ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই এবং পরিবারের বয়স্ক সদস্য; অন্যান্য বই ও ইন্টারনেটের সহযোগিতা নিয়ে অতীতের মানুষ কীভাবে উৎপাদন করত তা অনুসন্ধান করি।

অনুসন্ধান শেষে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিটি দল একটি করে রিপোর্ট তৈরি করল। রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ের ও ভৌগোলিক স্থানের উৎপাদনে ব্যবহৃত হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতির মডেল তৈরি করল।

প্রাচীন মানুষের উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভূমিকাভিনয়

এ কাজে তারা মাটি, কাগজ, শক্ত বোর্ড, কাঠ বা বাঁশ ইত্যাদি নানা ধরনের মাধ্যম বা জিনিস ব্যবহার করল। এসব মডেল ব্যবহার করে রিপোর্টে উল্লিখিত অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে অতীতের উৎপাদন পদ্ধতিগুলো উপস্থাপন করল।

চলো ওদের মতো আমরাও অতীতের উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করি এবং হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির মডেল তৈরি করে ভূমিকা অভিনয় করি।

পরিশিষ্ট -১

শিক্ষা সফরের নমুনা পরিকল্পনা

ভ্রমণের আগে

- বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিকল্পনায় সুবিধাজনক সময়ে ভ্রমণের জন্য সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ
- শিক্ষাভ্রমণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভ্রমণের স্থান নির্ধারণ
- শিক্ষাভ্রমণের গন্তব্য স্থান নিয়ে গবেষণা/ বিশেষ ভাবে জানা (উচ্চতর শ্রেণির শিক্ষার্থী সহকারে)
- গন্তব্য স্থানে প্রবেশ/পরিদর্শনের জন্যে অনুমতি গ্রহণ
- জেলা পুলিশ/ট্যুরিস্ট পুলিশ/প্রশাসনকে অবহতিকরণ
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে বিদ্যালয়ের ভ্রমণ কমিটি গঠন
- শিক্ষাভ্রমণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য মাথায় রেখে বিস্তারিত ভ্রমণসূচি প্রণয়ন (সংযুক্তি)
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ (বই, কাগজ, কলম, রেফারেন্স বই ইত্যাদি) তালিকাকরণ
- বাজেট প্রণয়ন, শিক্ষকদের দায়িত্ববণ্টন, শিক্ষার্থীদের দল গঠন
- যাতায়াত, থাকা, খাওয়া ও সার্বিক নিরাপত্তা
- অভিভাবকদের উদ্দেশ্য চিঠি (সংযুক্তি)
- শিক্ষার্থীদের অরিয়েন্টেশন (শিক্ষাভ্রমণে কেন যাচ্ছি, কি করব, কি করব না ইত্যাদি)
- গন্তব্য স্থানের প্রতিনিধির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন– প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স, খেলাধুলা, বাদ্যযন্ত্র, ডিভাইজ, ব্যানার তালিকাকরণ
- খাবারের মেন্যু নির্বাচন (স্থানীয় খাবারের অগ্রাধিকার)

ভ্রমণের দিন

- নির্দিষ্ট স্থানে অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষার্থী হস্তান্তর– নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা
- যানবাহনে মালামাল উঠানো
- শিক্ষকদের দায়িত্ব বণ্টন, শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর হাজিরা
- গন্তব্য স্থানের টিকিট, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রাস্তার টোল

শিক্ষাভ্রমণের সময়

- পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী থাকার স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাগ করা
- বিস্তারিত ভ্রমণসূচি অনুযায়ী কাজ
- শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক খেয়াল রাখা (নিরন্তর খবরদারি নয়) ও কাজে উৎসাহিত করা
- নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সাহায্য
- দলগত কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
- গল্প, আড্ডা, খেলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

ভ্রমণ শেষে

- অভিভাবকের কাছে শিশু হস্তান্তর
- শিক্ষার্থীদের কাজের প্রদর্শনীর আয়োজন
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে খরচের হিসাব
- এই ভ্রমণের অংশগ্রহণে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

বিশেষ লক্ষ্যণীয়-

- কেউ যেন বুলিংয়ের শিকার না হয়
- নিয়ম ভেঙে দলছুট যেন না হয়
- রাতে ঘুমানোর স্থানে মেয়েদের নিরাপত্তা
- মেয়ে শিক্ষার্থীর মাসিক হলে করণীয়
- কেউ অবৈধ কোনো কিছু সঙ্গে নিয়েছে কিনা বা করছে কি না লক্ষ রাখা

পরিশিষ্ট -২

বিশ্বভ্রমণ লুডো-নমুনা

পরিশিষ্ট -৩

বিশ্বভ্রমণ লুডো খেলার নিয়মাবলি

জোড়ায় খেলার নিয়ম	দলগত খেলার নিয়ম
• প্রতিটি বোর্ডে সর্বোচ্চ ৪ জন ও সর্বনিম্ন ২ জন খেলতে পারবে। • ১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা। • মৌখিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে কে আগে খেলা শুরু করবে। • গল্পে যে যে নিয়মগুলো সংযুক্ত আছে সেই নিয়ম অনুসারে খেলতে হবে। • ১০০ পয়েন্টে আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ, এখানে সকল খেলোয়াড়কে পৌঁছাতে হবে। যে সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সে জয়ী হবে।	• খেলাটি শিক্ষার্থীরা ৫-৬ জনের দলে ভাগ হয়ে খেলবে। • প্রতিটি বোর্ডে দুটো দল খেলতে পারবে। • প্রতি দলের একজন ক্যাপ্টেন থাকবে। • টসের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে, কোন দল আগে খেলা শুরু করবে। • ১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা। • দলের যে কোনো একজন খেলা শুরু করবে। কে শুরু করবে তা ক্যাপ্টেন নির্বাচন করবে। • খেলা চলাকালীন যে কোন সময় খেলোয়াড় বদল হতে পারবে। তবে একজন বদলি হলে সে পুনরায় আর খেলার সুযোগ পাবে না। • গল্পে যে যে নিয়ম সংযুক্ত আছে খেলাটি সেই নিয়ম অনুসারে খেলতে হবে। • খেলা সঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে প্রত্যেক বোর্ডের একজন রেফারি নির্ধারণ করতে হবে। রেফারি কে হবে তা দুই দলের ক্যাপ্টেন ঠিক করবে। যে রেফারি হবে সে খেলায় অংশ নিতে পারবে না। • ১০০ পয়েন্টে আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ, এখানে সকল খেলোয়াড়কে পৌঁছাতে হবে। যে দল সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সেই দল জয়ী হবে।

লুডো খেলার শর্তাবলি

লুডো খেলার সময় নিচের শর্তগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। বিভিন্ন স্থানে যে সব শর্ত বা অবস্থার কথা বলা হয়েছে ঐসব স্থানে গেলে তা সত্য ধরে নিয়ে খেলতে হবে। তবে এই নিয়ম, প্রশ্ন ও স্থানগলো কিছু নমুনা শর্ত মাত্র। তোমরা কিছু দিন পর পর অবশ্যই নতুন নতুন শর্ত তৈরি করবে এবং খেলাটিকে সব সময় আনন্দময় করে তুলবে।

অসুবিধাজনক স্থান

১. অজন্তা গুহা, ঔরঙ্গাবাদ- এ গুহায় এসে বের হওয়ার পথ পেতে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্ন: অজন্তা গুহা কিসের জন্য বিখ্যাত? প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ২ ঘর এগিয়ে তাজমহল-এ যাবে, না পারলে ২ ঘর পিছিয়ে বঙ্গোপসাগরে যাবে।

২. মাউন্ট এভারেস্ট (এ পর্বতশৃঙ্গে এসে পৌঁছালে এটি পার হতে তাকে দুই দিন অবস্থান করতে হবে। সেই কারণে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সে দুই দান খেলতে পারবে না।)

৩. মাওসিনরাম (বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের স্থান। এখানে এসে প্রবল বৃষ্টিপাতের মাঝে পড়বে। একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে একটি ছাতা পাবে এবং পরবর্তী ৫ ঘর এগিয়ে উলানবাতারে পৌঁছাবে, আর না পারলে ৫ ঘর পিছিয়ে কাবুল মরুভূমিতে যাবে। প্রশ্ন: অতি বৃষ্টিপাতের ফলে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে?

৪. চীনের মহাপ্রাচীর-এই প্রাচীর পার হতে তার অবশ্যই একজন গাইড লাগবে। গাইড পেতে ১ ফেলতে হবে। ১ না পড়া পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবে না।

৫. মাউন্ট ফুজি আগ্নেয়গিরি, জাপান আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে বাঁচতে তাকে অগ্ন্যুৎপাত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফলে সে একদান খেলা থেকে বিরত থাকবে।

৬. পশ্চিম সাইবেরিয়ান সমভূমি (রাশিয়া) (প্রশ্ন: সমভূমির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? প্রশ্নটির উত্তর পারলে ১ ঘর এগিয়ে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (রাশিয়া) তে যাবে, না পারলে ১ ঘর পিছিয়ে বৈকাল হ্রদে যাবে।)

৭. গ্রিস (এথেন্স, মাউন্ট অলিম্পাস) (এখানকার সভ্যতার পরিচিত দুটি উল্লেখযোগ্য দিক বলতে হবে। প্রশ্নটির উত্তর পারলে সে আবার খেলার সুযোগ পাবে, না পারলে ১ দান খেলা থেকে বিরত থাকবে।)

৮. ডেথ ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বিশ্বের উষ্ণতম স্থান) প্রশ্ন: পৃথিবার আর একটি উষ্ণতম স্থানের নাম বলো যা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ৬ ঘর এগিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যাবে না পারলে ৬ ঘর পিছিয়ে সাউদাম্পটন দ্বীপ, কানাডাতে যাবে।

৯. বেরিং সাগর (বেরিং প্রণালি) প্রশ্ন: এ প্রণালি কোন দুটি মহাদেশ কে পৃথক করেছে? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারলে সে তার দলের একজনকে ৫ দান পর্যন্ত সাহায্যকারী হিসেবে নিতে পারবে, আর না পারলে তার বিপক্ষ দল ৫ দান পর্যন্ত একজন সাহায্যকারী পাবে।

১০. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (১৮০ ডিগ্রি) (মানচিত্রে এ রেখাটি কোন কোন জায়গায় বেঁকে গেছে? প্রশ্নের উত্তর পারলে সরাসরি মাইক্রোনেশিয়াতে যাবে, না পারলে লন্ডন গ্রিনিচ, ইউকেতে নেমে যাবে।

১১. অ্যামাজন রেনফরেস্ট (জঙ্গলে গিয়ে সে পথ হারিয়ে ফেলবে, পথ খুঁজে পেতে তাকে ৬ ফেলতে হবে। ৬ না পড়া পর্যন্ত সে এগিয়ে যেতে পারবে না। ৬ পড়লে সে দক্ষিণ আফ্রিকায় হিরার খনির সন্ধান পাবে।)

১২. অ্যান্টার্কটিকা (তুষার ঝড় থেকে বাঁচতে তার একটি বিশেষ পরিবহণের দরকার হবে। সে তখনই পরিবহণটি পাবে যখন তার দলের যেকোনো একজন খেলোয়াড় ১ দানের সমপরিমাণ সময় বরফ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। যদি সে পারে তবে তার দল ৬ ঘর এগিয়ে ভিক্টোরিয়া ফলস (জিম্বাবুয়ে) এ যাবে আর না পারলে তার দল ২ দান খেলতে পারবে না।)

১৩. কেপ অফ গুড হোপ/ উত্তমাশা অন্তরীপ (দক্ষিণ আফ্রিকা): আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরের সীমানা। এখানে এসে সামুদ্রিক ঝড়ের মুখোমুখি হবে। পরের ধাপে যেতে খেলোয়াড়কে তার নিজের জীবনের এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানাতে হবে যা তাকে সামনের দিকে যেতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

১৪. সাহারা মরুভূমি: সাহারায় প্রচন্ড তাপ ও বালির ঝড়ের মুখোমুখি হবে। পরিত্রাণ পেতে ঝড় থামা পর্যন্ত ১ দিন অপেক্ষা করতে হবে। ফলে সে একদান খেলা থেকে বিরত থাকবে।

১৫. নীলনদ (মিশর) প্রশ্ন: নীলনদের তীরে কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ১ পয়েন্ট এগিয়ে পিরামিড দেখতে যেতে পারবে, আর না পারলে ১ পয়েন্ট পিছিয়ে সাহারা মরুভূমিতে যাবে।

১৬. মাদাগাস্কার (সাভানা) এই ধাপের প্রশ্ন: তৃণভূমিতে বড়ো বড়ো গাছ জন্মায় না কেন? প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ২ পয়েন্ট এগিয়ে ফ্রাঁসোয়া পেরন জাতীয় উদ্যান (অস্ট্রেলিয়া) যাবে, না পারলে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আরব মরুভূমিতে (সৌদি আরব) যাবে।

১৭. মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (পৃথিবীর গভীরতম খাদ) (এখানে আসলে সে ৪০ পয়েন্ট পিছিয়ে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে খাদে পড়ে যাবে।)

সুবিধাজনক স্থান

১. পামির মালভূমি (তাজিকিস্তান) পৃথিবীর বৃহত্তম এই মালভূমিতে আসলে পুরস্কার স্বরূপ সে পরপর দুইবার খেলার সুযোগ পাবে।

২ ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (রাশিয়া) (এখানে আসলে সে ৩ পয়েন্ট এগিয়ে পরের ধাপ কাস্পিয়ান সাগরে (কাজাখস্তান) যেতে পারবে।)

৩. মস্কোর ঘণ্টা, রাশিয়া: এখানে আসলে তার বিপক্ষ দলকে পৃথিবীর অন্য একটা বিস্ময়কর জায়গার নাম বলতে হবে। বিপক্ষ দল প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে তাদের দলের যেকোনো একজন খেলোয়াড়কে স্ট্যাচু হয়ে ১ দান খেলার সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

৪. কৃষ্ণসাগর (গ্রিস এবং ইউক্রেন এর মধ্যবর্তী, স্বাস্থ্যকর স্থান) এখানে আসলে সে একটা জীবন পাবে। যার সুবিধা স্বরূপ পরবর্তী যেকোনো একটা অসুবিধা যুক্ত স্থানে পৌঁছালে তাকে আর সেই অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে না।

৫. নেদারল্যান্ডস (ফুলের দেশ) এখানে আসলে তাদের বিপক্ষ দল একটি সত্যি ফুল/কাগজের তৈরি ফুল উপহার দেবে।

৬. দক্ষিণ আফ্রিকা (ডায়মন্ড মিনারেল) এখানে আসলে প্রচুর হিরার মালিক হবে তার দল এবং সুবিধা স্বরূপ ৫ ঘর এগিয়ে কঙ্গো রেইন ফরেস্ট (DR Congo) যাবে।

৭. পিরামিড (মিশর): (পিরামিডের দেশে আসলে সে তার বিপক্ষ দলের বন্ধুদের একটি প্রশ্ন করতে পারবে। প্রশ্নটি পিরামিড/ মিশর সংক্রান্ত হতে হবে। বিপক্ষ দল যদি উত্তর দিতে না পারে তবে তারা তাদের অবস্থান থেকে ৫ ঘর পিছিয়ে যাবে।)

৮. ইরাক (প্রাচীন সভ্যতা এবং তেল সম্পদ) এই প্রত্নতাত্ত্বিক ও খনিজ সম্পদে ভরপুর দেশে আসলে ১০ ঘর এগিয়ে নাউরু (ছোটোতম দ্বীপ, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর) এ যাবে।

৯. সিডনি অপেরা হাউস এখানে আসলে তার বিপক্ষ দল কে যেকোনো একটা লোক কাহিনী অভিনয় করে দেখাতে বলবে। তারা ঠিকভাবে না পারলে দলটি ৩ ঘর পিছিয়ে যাবে।

১০. কিরিবাতি (ক্রিসমাস দ্বীপ, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর)। এখানে আসলে সে সরাসরি ১০ পয়েন্ট এগিয়ে আন্দামান নিকোবর দীপপুঞ্জে পৌঁছে যাবে।

১১. আন্দামান নিকোবর দ্বীপ এখানে আসলে তার দল একটি উদ্ধারকারী জাহাজ পাবে এবং জাহাজে করে ঢাকা পৌঁছাবে।

পরিশিষ্ট - ৪

রিভার পাজল

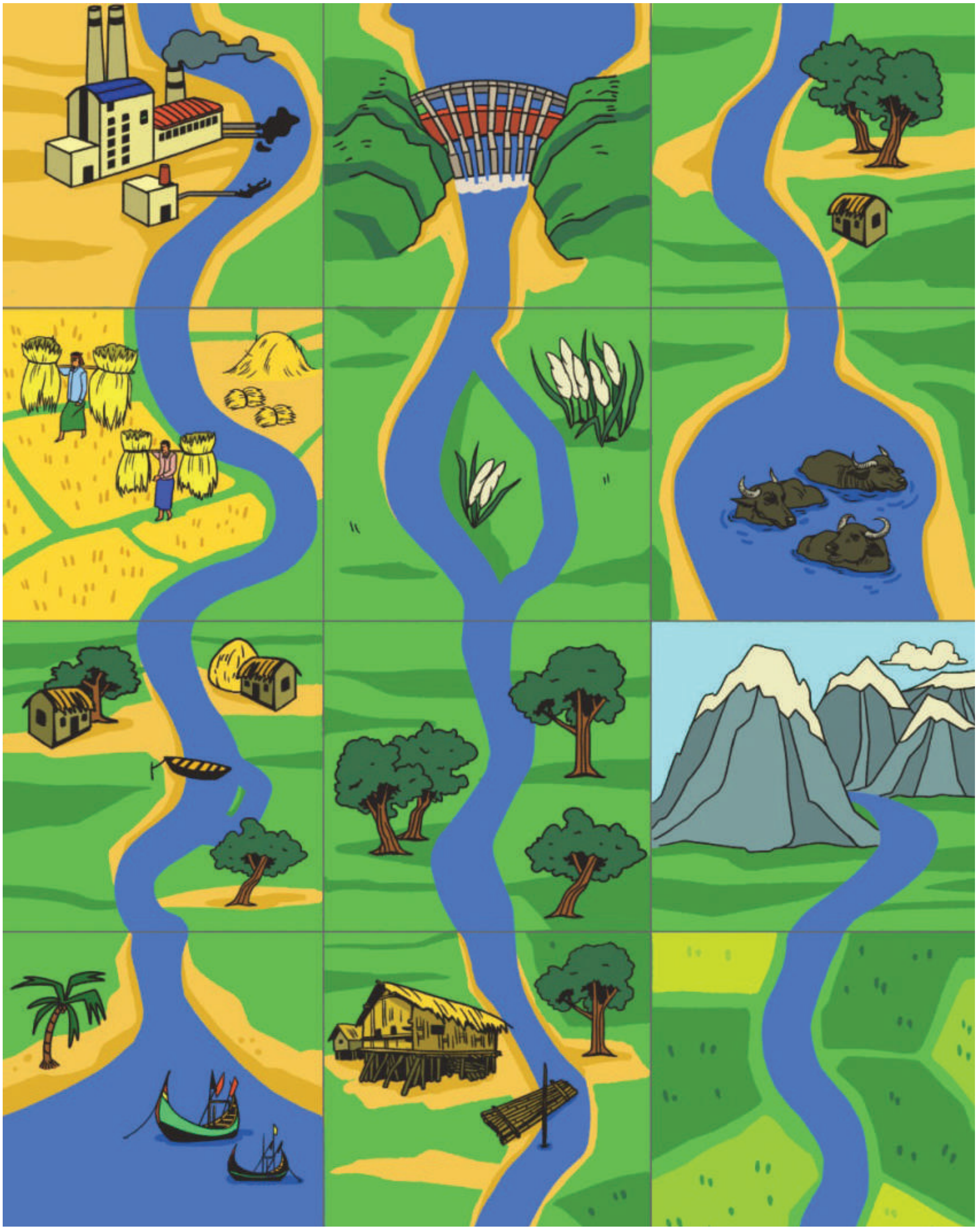

পৃষ্ঠাটি কেটে বই থেকে আলাদা করে নাও। তারপর ১৭২ পৃষ্ঠার দাগ দেওয়া ঘর থেকে কেটে ছোটো ছোটো চারকোনা আকৃতির ছবিগুলো আলাদা করে নাও। তারপর উৎস থেকে মুখ পর্যন্ত নদীটিকে তোমার মতো করে সাজাও। তারপর বইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করো।

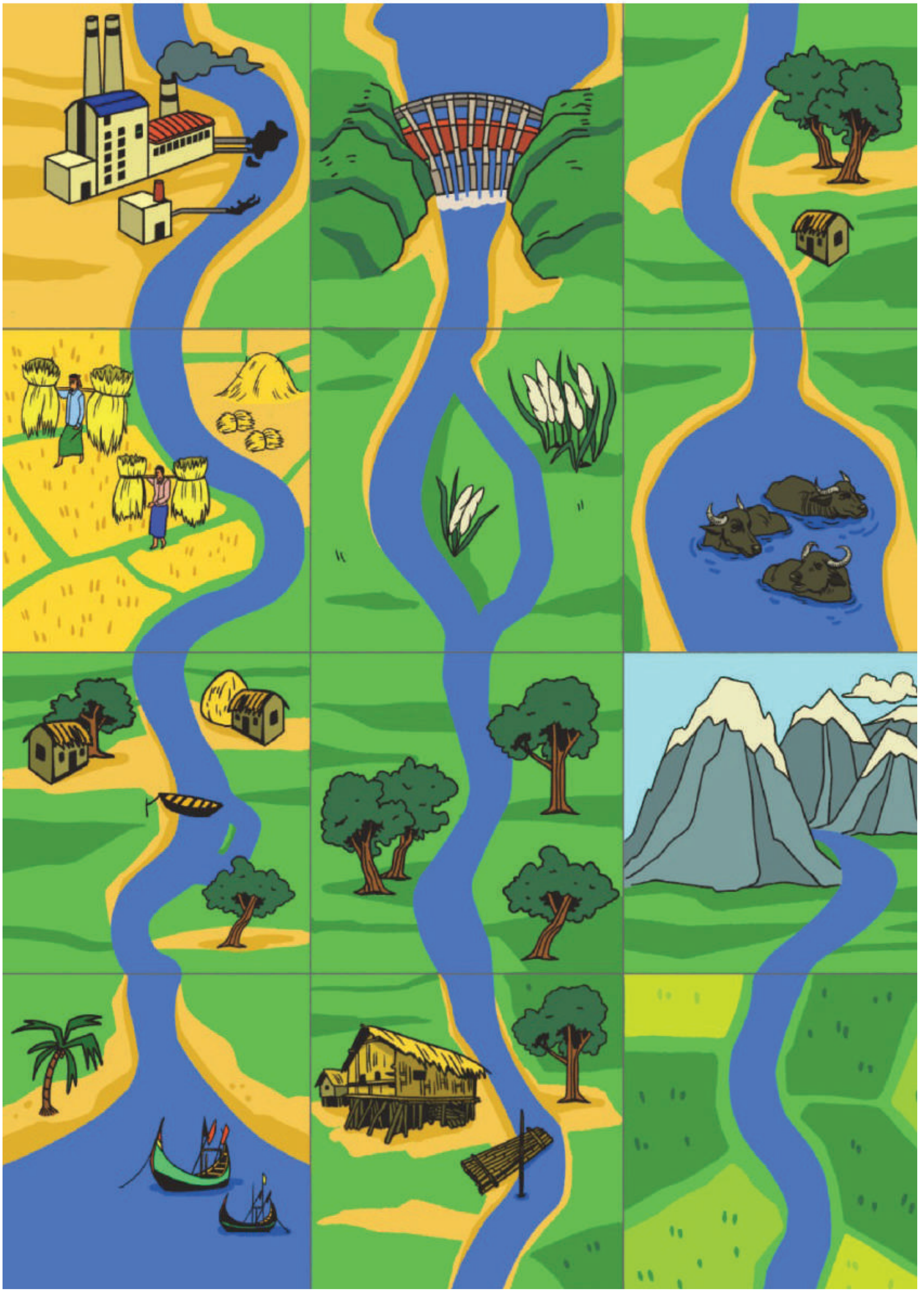

পৃষ্ঠাটি কেটে বই থেকে আলাদা করে নাও। তারপর ১৭৪ পৃষ্ঠার দাগ দেওয়া ঘর থেকে কেটে ছোটো ছোটো চারকোনা আকৃতির ছবিগুলো আলাদা করে নাও। তারপর উৎস থেকে মুখ পর্যন্ত নদীটিকে তোমার মতো করে সাজাও। তারপর বইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করো।

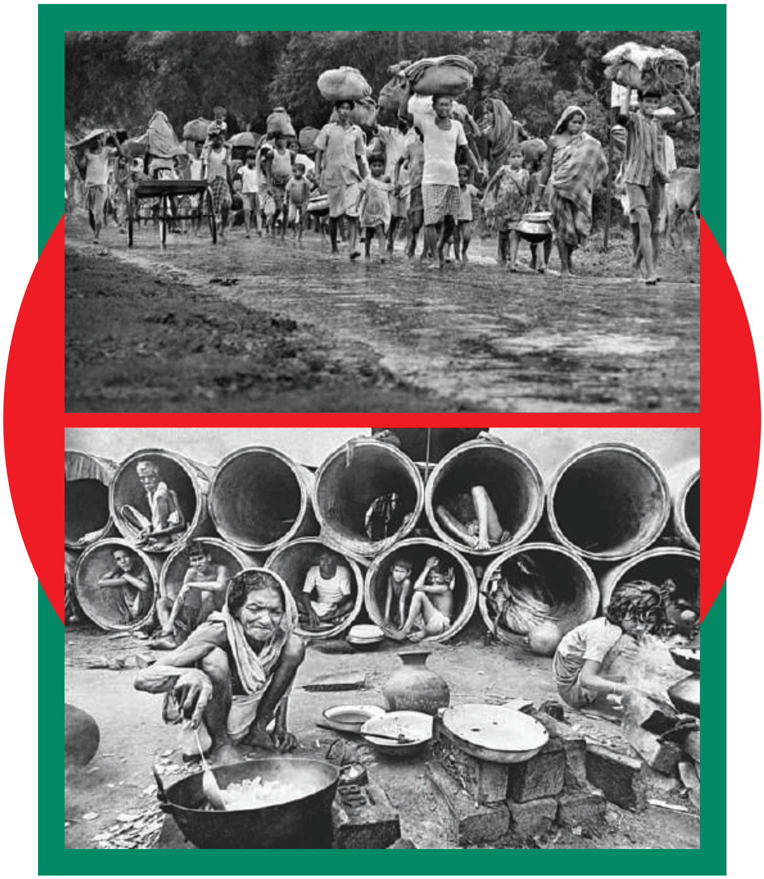

শরণার্থী: ১৯৭১

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পেতে এদেশের মানুষ বিভিন্ন পথে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একতাই বল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য